দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা তৃণমূলকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে
— পৃঃ ১১

বাবরের প্রতি নেহরু-গান্ধী পরিবারের আনুগত্য গোপন ইতিহাসের ইঙ্গিতবাহী
—পৃঃ ৩৫

৭১ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।। ২০ মাঘ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

মালদায় অমিত শাহ-র সভা
উজ্জীবিত রাজ্যবাসী

১৯ জানুয়ারির ব্রিগেড
ছবি মিথ্যা বলে না

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ২০ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৪ ফেব্রুয়ারি - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

খোলা চিঠি : ক্লাব স্বর্গ, ক্লাব ধর্ম, ক্লাব হি পরমন্তপঃ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

ই ভি এম নিয়ে গুলতানি আর নয় ▯ এস ওয়াই কুরেশি ▯ ৮

নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা তৃণমূলকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১১

অপপ্রচার, গুজব ও রাজনীতির খেলায় ফেঁসে রয়েছে নাগরিকত্ব পঞ্জিকরণ বিল ▯ রাম মাধব ▯ ১৩

উচ্চবর্ণের সংরক্ষণে মোদী প্রমাণ করলেন তিনি প্রচলিত নিয়ম ভাঙতে পারেন ▯ সুজয় চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৪

চীনে তিন দশকের মধ্যে নিম্নতম আর্থিক বৃদ্ধি ▯ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ▯ ১৫

মেয়েদের স্কুলে-কলেজে পাঠানোর দরকার নেই : হেফাজত-এ-ইসলাম ▯ ১৭

নরেন্দ্র মোদীকে এত ভয় কেন? ▯ শ্যামল কুমার হাতি ▯ ১৮

জাতীয় স্বার্থে নয়, মমতার ব্রিগেড সমাবেশ নিজের স্বার্থেই ▯ সনাতন রায় ▯ ২৩

সাত মন তেল পুড়লো, তবু রাধা নাচলো কই? ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৬

শত্রু এখন ঘরশত্রু ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৯

অসুস্থ শরীরেও মালদা এসে দলকে উজ্জীবিত করে গেলেন অমিত শাহ ▯ আদিনাথ ব্রহ্ম ▯ ৩০

জ্ঞানের দেবী সরস্বতী ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

ভারতের ছ'টি বিখ্যাত মহালক্ষ্মী মন্দির ▯ শ্যামনন্দন ▯ ৩৩

বাবরের প্রতি নেহরু-গান্ধী পরিবারের আনুগত্য গোপন ইতিহাসের ইঙ্গিতবাহী ▯ রাম ওহরি ▯ ৩৫

অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারে মস্তিষ্ক বিকলাঙ্গের ঝুঁকি বাড়ায় ▯ ৪১

সাধারণ হিন্দুর প্রধান শত্রু সেকুলার হিন্দুরা ▯ তরুণ বিজয় ▯ ৪৩

মূর্খকে শক্তি দ্বারা বশ করা অবশ্য কর্তব্য ▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

সমাবেশ সমাচার : ১৬ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ অন্যরকম : ৪২▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গান্ধী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

প্রিয়ঙ্কা গান্ধী রাজনীতিতে এসেছেন। গান্ধী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার আর একজন বেড়েছে। কংগ্রেসিরা লাফালাফি শুরু করেছেন। কারণ প্রিয়ঙ্কার আসার ফলে এবার নাকি একটা হেস্তনেস্ত হবেই! অর্থাৎ তারা বলতে চাইছেন রাহুলকে দিয়ে হচ্ছে না, প্রিয়ঙ্কাকে দিয়ে হবে। কিন্তু কী হবে? কতটাই বা হবে? গত লোকসভা ভোটে তারা পেয়েছে মাত্র ৪৪টি আসন। এই অবস্থার কতটা পরিবর্তন করতে পারবেন ফুলটাইম রাজনীতিতে আসা প্রিয়ঙ্কা? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— গান্ধী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডে প্রিয়ঙ্কার যোগদান এবং তাতে কংগ্রেসের সম্ভাব্য লাভক্ষতি।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মহাগঠবন্ধন, না মহাঠগবন্ধন ?

কলিকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে সভা অনুষ্ঠিত করিয়া তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে আরও একধাপ অগ্রসর হইলেন বলিয়াই মনে করিতেছেন তিনি। অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়া যাঁহারা ব্রিগেড ময়দানের সমাবেশ মঞ্চ আলোকিত করিতে আসিয়াাছিলেন—তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে মনে প্রধানমন্ত্রী হইবার বাসনা প্রকাশ করেন। অন্তরে সেই বাসনা লইয়াই তাঁহারা ব্রিগেডের মঞ্চ আলোকিত করিতে আসিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে কলিকাতাবাসী এইবার একই মঞ্চে এক ডজনেরও অধিক প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই দুর্লভ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কলিকাতাবাসীর হয় নাই। অতীতে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের অবসান ঘটাইবার আহ্বান জানাইয়া জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে এই ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে এক ঐতিহাসিক সমাবেশ হইয়াছিল। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশেও একাধিক প্রধানমন্ত্রী পদপ্রত্যাশী প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ কলিকাতাবাসীর হয় নাই। জয়প্রকাশ নিজেও প্রধানমন্ত্রী পদপ্রত্যাশী ছিলেন না। এবারের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রত্যাশীরা একত্রে একটি মহাগঠবন্ধনের জন্ম দিয়াছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়া কাহারা ব্রিগেড ময়দানের সভামঞ্চ আলোকিত করিতে আসিয়াছিলেন ? আসিয়াছিলেন এনডিএ ত্যাগী অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তেলুগু দেশম পার্টির নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু, উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী নেতা মুলায়ম-পুত্র অখিলেশপ্রসাদ যাদব, তামিলনাড়ুর ডিএমকে নেতা করুণানিধির পুত্র এম.কে. স্ট্যালিন, বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র অখিলেশ যাদব, কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা পিতা-পুত্র ফারুক এবং ওমর আবদুল্লা, কর্ণাটকের জেডিএস নেতা পিতা-পুত্র দেবগৌড়া এবং কুমারস্বামী, দিল্লির 'মাফলার বয়' মুখ্যমন্ত্রী আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মুম্বইয়ের মারাঠা নেতা শরদ পাওয়ার এবং রাজনীতিতে নবাগত জিগ্নেশ মেভানি ও হার্দিক প্যাটেল। মহাগঠবন্ধনে উদ্যোগী এই নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্রখানি কেমন—সঙ্গত কারণেই এই প্রশ্নটি উঠিতে পারে। অন্য কেহ সেই উত্তর দিবার বহু পূর্বেই এই সমাবেশের অন্যতম মুখ অরবিন্দ কেজরিওয়াল স্বয়ং প্রশ্নটির উত্তর দিয়া গিয়াছেন। ২০১৪ সালে কেজরিওয়াল দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই তালিকায় তিনি যাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন, চন্দ্রবাবু নাইডু, লালুপ্রসাদ যাদব, শারদ পাওয়ার, কানিমোঝি (করুণানিধির কন্যা), মুলায়ম সিংহ যাদব, প্রফুল্ল প্যাটেল, মায়াবতী প্রমুখ। মাত্র নয়টি বৎসরের মধ্যে এই নেতাদের চরিত্রে যে আমূল পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা নহে। বিস্ময়ের বিষয় হইল, মাত্র এই কয়বৎসরে তিনি এবং তাঁহার মন্ত্রীসভায় সদস্যরা নানাবিধ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হইবার পর এখন অরবিন্দ কেজরিওয়াল স্বয়ং তাঁহার তালিকাভুক্ত এই দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের সঙ্গে মহাগঠবন্ধনের অঙ্গীকার করিতেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর নাবালক পৌত্রের নামে তিন হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়াছে। মুলায়ম-পুত্র অখিলেশের মুখ্যমন্ত্রীত্ব চলিয়া যাইবার পর সাতশো কোটি টাকা ব্যয়ে হোটেল নির্মাণের বিষয়টিও নজরে আসিয়াছে। পশুখাদ্য মামলায় ১৩০০ কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের দায়ে আদালতের নির্দেশে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন তেজস্বীপ্রতাপের পিতা লালুপ্রসাদ। উত্তরপ্রদেশের বহেনজি মায়াবতীর বিরুদ্ধে কয়েক সহস্র কোটি টাকার দুর্নীতির তদন্ত চলিতেছে। পূর্বতন ইউপিএ জমানার ডিএমকে মন্ত্রীরা এবং করুণানিধির পরিবারের সদস্যরা টু-জি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। মারাঠা নেতা শারদ পাওয়ারের দুর্নীতির সাতকাহন লিখিয়া শেষ করিবার উপায় নাই। তদুপরি রহিয়াছেন ব্রিগেড সমাবেশের আহ্বায়ক, স্বয়ং তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারদা, নারদা এবং রোজভ্যালি কেলেঙ্কারিতে যিনি কলঙ্কিত হইয়াছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রিগেডে কোনও জয়প্রকাশ নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন না। ছিলেন সুপরিচিত এই কলঙ্কিত নেতারা। প্রশ্ন উঠিবেই, ইহাদের জোট কি সত্যই মহাগঠবন্ধন, নাকি প্রকারান্তরে মহাঠগবন্ধন ?

সুভাষিতম্

দুর্জনেন সমং সখ্যং প্রীতিং চাপি ন কারয়েৎ।

উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করম্।। (হিতোপদেশ)

দুর্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রেম করা উচিত নয়। কেননা গরম অঙ্গার হাত জ্বালিয়ে দেয় এবং ঠাণ্ডা অঙ্গার হাত মলিনবর্ণ করে।

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান --- দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ক্লাব স্বর্গ, ক্লাব ধর্ম, ক্লাব হি পরমন্তপ

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

ভোট এক খেলা। আর সেই খেলার জন্য চাই ক্লাব। আর ক্লাবকে হাতে রাখতে চাই টাকা। সুতরাং, সরকারি টাকা বিলিয়ে চলেছেন দিদি মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। অবশ্য কীই বা করবেন তিনি। চিটফান্ডগুলো বন্ধ। একে একে অনেকেই জেলে। ওদের টাকাতেই তো চলত তৃণমূলের হাজার হাজার ক্লাব। না, ভোটের মুখে দিদির নিন্দা করবেন না। প্লিজ। শুধু ভালো মন নিয়ে পড়ুন রাজ্যের ক্লাবকে বাঁচাতে ঠিক কী কী করছেন তিনি।

নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'খেলাশ্রী' সম্মান জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রায় সাড়ে চার হাজার ক্লাবকে ফের ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিলেন তিনি, যারা আগে কখনও অনুদান পায়নি। অনুদান পেল বেশ কিছু স্পোর্টস কোচিং সেন্টারও। যেসব ক্লাব আগে অনুদান পেয়েছে, সেগুলিকেও ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হলো। 'খেল সম্মান', 'বাংলার গৌরব', 'ক্রীড়া গুরু', 'জীবনকৃতী' এবং 'বিশেষ সম্মান' পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সব মিলিয়ে ৫৬ জনকে।

ক্লাবগুলিকে আর্থিক অনুদান এই প্রথমবার দেওয়া হলো, এমন নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েক দফায় অনুদান দেওয়া হয়েছে ক্লাবগুলিকে। এবার লোকসভা নির্বাচনের প্রায় আড়াই মাস দূরে দাঁড়িয়ে আরও একবার অনেকগুলো ক্লাব মুখ্যমন্ত্রীর অনুগ্রহ পেল। মোট ৪ হাজার ৩০০ ক্লাবকে এদিন অর্থ সাহায্য দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। খেলাধুলোর উন্নতির স্বার্থেই ক্লাবগুলিকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হলো বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

শুধু ক্লাব অবশ্য নয়, এবার মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান পেল ২২১টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টারও। ওই সব কোচিং সেন্টারে যাতে আরও ভালো ভাবে কোচিং দেওয়া সম্ভব হয়, তার জন্যই এই অনুদান বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। কোচিং সেন্টারকে অনুদান দেওয়া এই প্রথম।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, যাঁরা এবার অনুদান পেলেন, তাঁরা আবার পেতে পারেন। এবারে পাওয়া টাকা কোন কোন খাতে খরচ হলো, তার অডিট রিপোর্ট জমা দিতে পারলে সামনের বার আবার এই ক্লাবগুলি ১ লক্ষ টাকা করে পাবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

নেতাজী ইন্ডোরের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, আগে অনেকেই খেলোয়াড়দের স্পনসর করতে এগিয়ে আসতেন বা ক্লাবগুলোকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির নজরদারির ভয়ে অনেকেই সেসব থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

খেলাধুলোয় যাঁরা ভালো, রাজ্য সরকার তাঁদের চাকরি দেবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন ঘোষণা করেছেন। জঙ্গলমহল কাপের মতো টুর্নামেন্ট বা রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় স্থানীয় স্তরের নানা খেলার আসরে যাঁরা ভালো ফল করবেন, তাঁদের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

জোট হলো না। বিজেপি বাড়ছে। কংগ্রেস বা সিপিএম ভোট কাটার মতো বাড়ছে না। এই পরিস্থিতিতে পুজো কমিটিগুলোকে টাকা দিয়ে অনেকটা কাছে টানা গিয়েছে। এবার ক্লাব। আগেও ক্লাব কাজে দিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচন থেকে পঞ্চায়েত সবেতেই উদ্ধার করে দিয়েছে ক্লাবসম্পদ। লোকসভাতেও বৈতরণী পার করে দিতে কোমর বেঁধে তৈরি ক্লাবেরা। টাকা পৌঁছে গিয়েছে। এবার শুধু মাঠে নামা বাকি। উন্নয়ন লাঠি হাতে দাঁড়াবে রাস্তার মোড়ে মোড়ে।

— **সুন্দর মৌলিক**

ই ভি এম নিয়ে গুলতানি আর নয়

অতিথি কলম

এস ওয়াই কুরেশী

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়, ইলেকট্রনিক্স ভোটিং মেশিনে বোতাম টিপে ভোট দেওয়া নিয়ে আবার নতুন করে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। এর যেন কোনো শেষ নেই। কয়েকমাস ছেড়ে ছেড়েই নড়ে চড়ে ওঠে। সাম্প্রতিক বিতর্কটির ভরকেন্দ্র আবার দেশ ছেড়ে সুদূর লন্ডন শহরে। জনৈক আমেরিকান সাইবার বিশেষজ্ঞ ভোটিং মেশিনে কীভাবে জালিয়াতি করে নির্বাচনী ফলাফল বদলে দেওয়া যায় তা হাতে কলমে দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমন শিহরণজাগানো প্রতিশ্রুতির মধ্যে দেশ একটি সম্ভাব্য ভূমিকম্পের মতো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করেছিল যা শেষমেশ অতি নিম্নমানের নাটকেই শেষ হলো।

জনৈক সৈয়দ সুজা যিনি নিজেকে একজন সাইবার বিশেষজ্ঞ বলে পরিচয় দেন, তিনি নাকি বর্তমানে মার্কিন সরকারের দয়ায় সে দেশে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে বসবাস করছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ইভিএম মেশিনে জালিয়াতি করে জেতানোর গোপন তথ্য জানতেন। এরই ফলস্বরূপ ভারতে তাঁকে ও তাঁর কিছু শাকরেদদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁর বেশ কিছু লোককে ইতিমধ্যেই খুনও নাকি করা হয়েছে। এমন কথাও তিনি বলেছেন। তথাকথিত 'সত্য' বলে সুজা যে তথ্য পরিবেশন করেছেন— আমি নিশ্চিত এই সম্পর্কিত দেশের ভারপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি তার প্রামাণ্যতা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি তার মধ্যে নাক গলাতে চাই না। আমি শুধু ইভিএম মেশিন কতদূর জালিয়াতি যোগ্য সেই আলোচনাতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখব। যেহেতু, এই ধরনের অভিযোগ কিছু নতুন নয় সেই কারণে আমাদের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য সংবলিত বহু অভিযোগের ইতিহাস নথিবদ্ধ আছে। কিছু কিছু ব্যক্তি বিশেষ ছাড়াও প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই কোনো না কোনো সময় এই যন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্যালট পেপার পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার দাবিও জানিয়েছেন। মজার কথা তাঁরা এই মেশিনের সাহায্যেই নিজেরাও নির্বাচনে জিতেছেন।

আচ্ছা, ব্যালট পেপার কি সত্যি সত্যিই সবকিছু ওলটপালট করে দিতে পারে? এ প্রসঙ্গে বিগত ২০১০ সালের জুলাই মাসে যখন তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরি নিয়ে বিরোধিতা তুঙ্গে তখনকার একটি ঘটনা বলছি। অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা থেকে সেই সময় ১২ জন বিধায়ক পদত্যাগ করেছিলেন। রাজ্যভাগের পক্ষে থেকে তাঁরা পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই একই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইভিএম-এর বিরোধিতা করে আন্দোলনও তীব্র হয়ে উঠেছিল। আমি মুখ্য নির্বাচনী আয়োগ হিসেবে খুবই প্রযুক্তি কুশলী তৎকালীন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু সমেত অন্যান্য সব বিরোধী দলের ইভিএম বাতিলের দাবি নাকচ করে দিয়েছিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে দলগুলি একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করেছিল। সেই মেশিনগুলিতে ৬৪ জনের বেশি প্রার্থীর নাম গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। টি আর এস দল বিভিন্ন কেন্দ্রে নানা নামে কায়দা করে ৬৪ জনের বেশি সংখ্যক প্রার্থী দাঁড় করায়। নিজামাবাদ জেলার অন্তর্গত ইয়েলারডি কেন্দ্রে সর্বাপেক্ষা ১১৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিল। এর পরই ছিল সিরসিলা কেন্দ্র যেখানে সংখ্যা ছিল ১০৭। ব্যাপক সংখ্যায় প্রত্যাশীদের মনোনয়ন পত্র বাতিল হওয়ার পরও ৬টি কেন্দ্রে প্রার্থীর সংখ্যা মেশিন ক্ষমতা অনুযায়ী ৬৪ ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে নির্বাচন কমিশনকে ওই কেন্দ্রগুলিতে ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করতে বাধ্য হতে হয়। বাকি ৬টি কেন্দ্রে কিন্তু ইভিএম-ই ব্যবহৃত হয়।

> **নির্বাচন আয়োগ ইভিএম চক্রান্তের তথ্য প্রচারকারীদের বারবার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছে তাঁরা যেন আয়োগের কার্যালয়ে এসে হাতে-কলমে তাঁদের অভিযোগ প্রমাণ করে দিয়ে যান। কিন্তু শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশি, কোনো দলই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের হিম্মত দেখায়নি।**

সেই সময়কার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে আমি এই পরিস্থিতিকে একটি সুযোগ হিসেবে নিয়েছিলাম। যেখানে প্রকাশ্যে আসবে উভয় পদ্ধতির তুলনামূলক সুবিধে ও ক্ষমতা। শুনলে অবাক হবেন ইভিএমে ভোট গৃহীত কেন্দ্রগুলির ফলাফল চার ঘণ্টায় প্রকাশ পেলেও ব্যালটধারী কেন্দ্রগুলিতে সময় লেগেছিল ৪০ ঘণ্টা। আর ব্যালট পেপারের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ব্যালট পেপার বাতিল ভোট হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল ব্যালট পেপারের জন্য বাড়তি বিপুল খরচ ও নির্বাচনী কর্মীদের দীর্ঘ সময় ধরে হাতে ভোট গোনার ক্লান্তি। কিন্তু দু'টো ব্যবস্থা থেকেই ফলাফল কিন্তু পুরো একই রকম হয়েছিল। তা হলে এই ছেলেখেলা করে কী পাওয়া গিয়েছিল? মহাশূন্য।

আচ্ছা, সেই সময় রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান কী ছিল? তৎকালীন টি আর এস দলের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল কংগ্রেস দল

ইভিএমের কারচুপি করে ভোটে জিতবে। এই খবর একটি বিশিষ্ট সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। টিডিপি'র সভাপতি চন্দ্রবাবু নাইডু ১২টি কেন্দ্রেই ব্যালটে ভোটের দাবি করেছিলেন। একই সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা বহুবার নির্বাচন আয়োগের কাছে আবেদন করেছেন যে ইভিএম কখনই কারচুপির ঊর্ধ্বে নয়। তৎকালীন অন্ধ্রের বিজেপি সভাপতিও এই সূত্রে ভারতব্যাপী আলোচনার দাবি তুলেছিলেন।

হায়! কংগ্রেসের মুখপাত্র কমলাকর রাও বলেছিলেন যে তাঁর ভাবতে খুবই খারাপ লাগছে যে, রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী আয়োগের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছে। বাধ্য করছে আয়োগকে শুধু শুধু বাড়তি খরচ করতে। হায়রে কোথায় গেল সেইদিন!

২০১৪ সালের পর বারবার বিজেপির ওপর এই মেশিনের অপপ্রয়োগ করার অভিযোগ উঠেছে। যদিও একবারও কোনো কিছুই প্রমাণিত হয়নি। একজন মান্যগণ্য নেতা বলে বসলেন এই মেশিনে কারচুপির জন্য ৯০ সেকেন্ডই যথেষ্ট। অন্যদিকে নির্বাচন আয়োগ এই ধরনের চক্রান্তের তথ্য প্রচারকারীদের বারবার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছে তাঁরা যেন আয়োগের কার্যালয়ে এসে হাতে কলমে তাঁদের অভিযোগ প্রমাণ করে দিয়ে যান। কিন্তু শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশি, কোনো দলই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের হিম্মত দেখায়নি।

মনে রাখা দরকার, ২০১০ সালে ইভিএমের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় বিরোধিতার সময় একটি সর্বদলীয় বৈঠকে ভোট দেওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT) চালু করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। আয়োগে এই প্রসঙ্গে আবেদন জানানো মাত্রই নির্বাচন আয়োগ তা মেনে নেয়। যে দুটি কারখানায় ইভিএম তৈরি হতো তাদেরই ভিভিপিএটি মেশিনও সরবরাহ করার বরাত দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি বিশেষজ্ঞ সংবলিত কমিটিকে এই কাজ তদারকির ভার দেওয়া হয়। ২০১১-১২-তে একটি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পুরো দু'দিন ঠিক ভোটের সময়কার বাস্তব পরিবেশ নির্মাণ করে সম্পূর্ণ বিপরীত আবহাওয়ার অঞ্চলে (তিরুবন্তপুরম, জয়সলমির, লেহ্ দিল্লি ও চেরাপুঞ্জি) হাতে কলমে মহড়া দেওয়ার পরই ভিভিপিএটি চালু করা হয়।

প্রথমদিকে পরীক্ষামূলকভাবে ২০ হাজার বুথে ভিভিপিএটি-র ব্যবস্থা করা হয়। মেশিনগুলি সফলভাবেই পরীক্ষায় উতরে যায়। মেশিনের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে সমস্ত নির্বাচনী কেন্দ্রের সমস্ত বুথেই ছাপার যন্ত্র ভিত্তিক ভিভিপিএটি চালু হয়ে যাবে।

২০১৩ সালে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচন আয়োগের জনমন থেকে ইভিএম মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ এইভাবে দূর করে দেওয়ার এই প্রচেষ্টাকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানায়। আদালত সরকারকে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে যাতে প্রত্যেকটি বুথে ভিভিপিএটি ব্যবহার করা যায় তার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। ২০১৫ সাল থেকে সমস্ত রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে এই মেশিন ব্যবহৃত হয়। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর নমুনা হিসেবে ১৫০০ মেশিনের ভোটের ফলাফল সংশ্লিষ্ট ইভিএমগুলিতে প্রদত্ত ভোটের সঙ্গে মেলানো হয়। ফলাফল সম্পূর্ণ একই আসে। একটি মাত্র ভোটেরও হেরফের পাওয়া যায়নি। অবিসংবাদিত ভাবে ভিভিপিএটি-ই চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে গণ্য হয়।

২০১৮ সালে নির্বাচনী আয়োগের তরফে এক সমীক্ষায় সমস্ত সক্রিয় মেশিনগুলির মধ্যে মাত্র ১১ শতাংশ ক্ষেত্রে কিছুটা গোলযোগ নজরে আসে। ইভিএমের ক্ষেত্রে এই গোলমালের হার মাত্র ৫ শতাংশ। গোলমাল অর্থাৎ ভোট গ্রহণের সময় খারাপ হওয়া, অন্য কিছু নয়। প্রয়োগ কুশলীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর কারণ ইভিএম solid state machine, অন্যদিকে ভি ভি প্যাট মেশিন electro mechanical device যার যন্ত্রাংশগুলি সর্বদা চলমান থাকে। একটি সহজ প্রতি তুলনা এরকম— ক্যালকুলেটর (সলিড স্টেট হওয়ায় বছরের পর বছর খারাপ হয় না।) কিন্তু কম্পিউটার প্রিন্টার (প্রায়শই প্রিন্ট আউটগুলি আটকে যায়, টোনারের কালি শুকিয়ে যায়)। এর সহজ সমাধান বাড়তি মেশিন সদা হাতের কাছে মজুত রাখা যাতে চট করে ভোটের সময় বদল করে নতুন মেশিন দিয়ে দ্রুত ভোট চালু করে দেওয়া যায়।

ফলে ভোটকেন্দ্রেও ঝামেলা এড়ানো সহজ হবে। অতি সম্প্রতি কংগ্রেস দল দাবি করছে সমস্ত ইভিএম যেন ভিভি প্যাটের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ও কম করে সমস্ত ভিভি প্যাটের অন্তত ৫০ শতাংশ যেন গণনা করা হয়। বলা দরকার, প্রথমটি ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী চালু আছে। দ্বিতীয় আর্জিটি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আমার মতে বর্তমানে বলবৎ থাকা একটি কেন্দ্রের জন্য একটিমাত্র মেশিনের মাধ্যমে ভোট গণনার রীতি পুনর্বিবেচনা করার অবকাশ আছে।

এক সময়ের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ওপি রাওয়াত আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আয়োগ কলকাতার আই এস আই-এর কাছ থেকে অভিমত চেয়েছে যে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আদর্শ পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা কত হওয়া উচিত যাতে ৯৯.৯৯ শতাংশ নাগরিককে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে মানসিকভাবে সন্তুষ্ট করা যায়। এর চেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়াস আর কী হতে পারে?

(লেখক পূর্বতন মুখ্য নির্বাচনী আয়োগ)

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

রম্যরচনা

● এক পাহাড় চূড়ায় একদিন এক মেষপালক মেষ চরাচ্ছিল। হঠাৎই সেখানে হাজির হয়েছেন এক ব্যক্তি। তিনি অনেকক্ষণ মেষগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর মেষপালককে বললেন—' বাহ্, তোমার এই গোরুগুলি তো চমৎকার। আমাকে বিক্রি করবে? মেষপালক দেখল এই মওকা। সে বলল — ' একলক্ষ টাকা দিয়ে সবকটাকে নিয়ে যান।' লোকটি একলক্ষ টাকা দিয়ে সবকটি মেষ কিনে নিল। মেষগুলিকে নিয়ে লোকটি যখন চলে যাচ্ছে তখন রাখাল বলল— এতগুলি গোরু যখন কিনলেন তখন বাছুরটিকেও আর কিছু টাকা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যান। লোকটি সবকিছু নিয়ে যখন চলে যাচ্ছে তখন রাখাল পিছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল— 'আচ্ছা, আপনার নাম রাহুল গান্ধী, তাই না? লোকটি অবাক হয়ে বলল—'ঠিক বলেছ। কী করে জানলে তুমি?' রাখাল হেসে বলল—'এ তো সোজা। আমার মেষগুলিকে আপনি গোরু বলে কিনে নিলেন আর কুকুরছানাটিকে বাছুর বলে আপনার কাছে চালিয়ে দিলাম।'

উবাচ

"বিজেপি-র 'ওআরওপি' হচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কল্যাণে, কিন্তু কংগ্রেসের 'ওআরওপি' হচ্ছে 'শুধু রাহুল, শুধু প্রিয়াঙ্কা।' একটি পরিবারকে শক্তিশালী করাই একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসের।"

অমিত শাহ
বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ

হিমাচলে দলীয় কর্মকর্তাদের সভায় বক্তব্যে।

"আমি যেভাবে রাজ্য চালাচ্ছি তা যদি পছন্দ না হয়, তবে আমি ইস্তফা দিতে রাজি আছি। আমি ক্ষমতা চাই না। কংগ্রেস সীমা লঙ্ঘন করছে।"

এইচ ডি কুমারস্বামী
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী

জোট শরিক কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ প্রসঙ্গে।

"দেশের মানুষ চান অযোধ্যায় রামমন্দির হোক। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বলতে পারি, বিগত ৭০ বছর ধরে বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। রামমন্দির নির্মাণের সমস্যার যত দ্রুত সমাধান করা যায় ততই মঙ্গল।"

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

রামমন্দির মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে।

"নির্বাচন কোনো সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা বা কুস্তি প্রতিযোগিতা নয়। এটা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। এখানে মানুষ কাজ দেখেই ভোট দেয়।"

সুশীল মোদী
বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর রাজনীতিতে আসা প্রসঙ্গে।

নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা তৃণমূলকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে

সাধন কুমার পাল

অসমে সদ্য অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। অসমীয়দের ভোট পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। বাঙ্গালি হিন্দু এবং বঙ্গভাষী মুসলমানরাও ভোট দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেসকে। এতে প্রমাণিত এন আর সি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মানুষকে খেপিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা ব্যর্থ। অসম থেকে মমতা ব্যানার্জি শিক্ষা নেবেন বলে মনে হয় না। তৃণমূল কংগ্রেস এখনো এন আর সি নিয়ে লাগাতার মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমানদের বোঝাচ্ছে যে, এন আর সি চালু করে বিজেপি অনুপ্রবেশকারী তকমা লাগিয়ে তাদের দেশ ছাড়া করার পরিকল্পনা করছে। উদ্বাস্তু বাঙালিদের বিভ্রান্ত করতে গঠন করা হয়েছে নমঃশূদ্র উন্নয়ন পর্ষদ, মতুয়া উন্নয়ন পর্ষদ। এই পর্ষদগুলির মাথায় যাদের বসানো হয়েছে তাদের দিয়েই তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটিই— মিথ্যা আতঙ্ক ছড়িয়ে বাংলাদেশি হিন্দুদের এবং ঘৃণা ছড়িয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটে ক্ষমতায় টিকে থাকা। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৬ নিয়ে বিতর্ক চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেস যে ভাবে বিলের বিরোধিতা করে লোকসভা থেকে ওয়াক আউট করেছে তা এক কথায় আত্মঘাতী।

স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পরা উচ্চ বর্ণের মানুষকে দশ শতাংশ সংরক্ষণ প্রদান করার জন্য বিজেপির আনা বিলকে সমস্ত দলই সমর্থন করেছে। ফলে নির্বিবাদে পাশ হয়ে গেল এই সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল। ঠিক একই রকম ভাবে পৃথিবীর নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর তালিকায় স্থান করে নেওয়া উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙ্গালিদের নাগরিকত্ব প্রদানের যে প্রস্তাব বিজেপি এনেছে তাতে সমর্থন করলে ভোটের বাজারে অনেক বেশি লাভ হতে পারতো। কিন্তু মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের অন্ধ অনুসরণ কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলিকে বিপথে চালিত করে ঐতিহাসিক ভুলের পথে ঠেলে দিয়েছে। অসম থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বলছে, তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাদেশ থেকে আগত সর্বস্ব খোয়ানো হিন্দুদের নাগরিকত্বের বিরোধিতা করে হিন্দু সমাজের ভোটব্যাঙ্ক মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হবে, সেই সঙ্গে হারাবে মুসলমান ভোটও।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের ঘা এখনো শুকোয়নি। তাছাড়া এখনও প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশ থেকে হিন্দু নির্যাতনের খবর আসছে। এখনো ইজ্জত ধনমান সম্পত্তি বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশি হিন্দুরা প্রাণটুকু বাঁচাতে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। দেশভাগের পর ভারত ধর্মনিরপেক্ষ হলেও খণ্ডিত অংশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইসলামিক দেশ। একদা ভারতের অংশ এই সমস্ত ইসলামিক দেশের মুসলমানরা কোনো যুক্তিতেই ভারতের নাগরিকত্ব দাবি করতে পারে না। সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। উদ্বাস্তুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি জাতি, ধর্ম, সামাজিক বা ধর্মীয় কারণের জন্য অত্যাচারিত হচ্ছেন বা হওয়ার আশঙ্কায় দেশ ছেড়েছেন তাঁরাই উদ্বাস্তু। মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক কারণে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে চলে আসা কাউকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংজ্ঞা অনুসারে উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করা যায় না। কেবলমাত্র গরিব হলেই অন্য দেশে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার বা রোজগার করার অধিকার জন্মায় না। এই সহজ সত্যটুকু বোঝার ক্ষমতা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের আছে। ফলে মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর দলের অযৌক্তিক মাত্রাতিরিক্ত তোষণ মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি তো করবেই না, বরং বিরক্ত করবে।

হিন্দু বাঙ্গালিদের ভোটে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি এই বিলের বিরোধিতা করে বিতর্ক চলাকালীন সংসদ থেকে ওয়াকআউট করলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দল এই বিলের বিরোধিতা করার সাহস পাচ্ছে, কারণ চেতনাহীন বাঙ্গালিদের কোনো সামগ্রিক ভোটব্যাঙ্ক নেই।

তাছাড়া সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন ও অসমের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল বলছে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক এখন আঞ্চলিক দল ছেড়ে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছে। এর বড়ো প্রমাণ হলো অসমের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বদরুদ্দিন আজমলের এ আই ই ইউ ডি এফের খারাপ ফল। সেজন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬-র বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেসের এখন 'আমও গেল ছালাও গেল' অবস্থা। নাগরিকত্ব বিলে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানের যে অভিযোগ উঠছে সেটার কোনো ভিত্তি নেই। কারণ এই বিলে শুধু হিন্দুদের নয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ২০১৪ সালের ৩১

ডিসেম্বরের মধ্যে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ ও পার্শিদের নাগরিকত্ব প্রদানের কথা সমান ভাবে বলা হয়েছে। হিন্দুদের সঙ্গে এই সম্প্রদায়গুলিও শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে ইসলামিক দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানে মুসলমান জঙ্গি জেহাদিদের বর্বরতার শিকার হয়ে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে।

অসমে যে সমস্ত দল এই বিলের বিরোধিতা করছে তাদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা যে ক্রমহ্রাসমান এটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। স্থানীয় ইস্যুর ভিত্তিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন হলেও এবার অসমের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মূল ইস্যু ছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬। অসমে কংগ্রেস-সহ সমস্ত আঞ্চলিক দলের অপপ্রচারকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। এক, এন আর সি করে বিজেপি বাঙ্গালি ও মুসলমানদের বিতাড়নের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। দুই, বিল এনে বাংলাদেশি হিন্দুদের নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করে অসমীয়দের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে চাইছে। এই বিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের ব্যানারে বনধও ডাকা হয়েছিল। আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য তিনসুকিয়ায় পাঁচজন নির্দোষ হিন্দু বাঙ্গালিকে খুন করা হয়েছিল। প্রচার করা হয়েছিল এই বিল পাশ হলে বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু বাঙ্গালির স্রোতে অসম ভেসে যাবে। উদ্দেশ্য একটিই— আতঙ্ক সৃষ্টি করে বিজেপিকে কোণঠাসা করে রাজনৈতিক ফয়দা তোলা।

মনে রাখতে হবে, এই বিল শুধু অসমের জন্য নয়, ভারতের সমস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসরত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ ও পার্শিদের নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে। তথ্য পরিসংখ্যান বলছে, অসমে বিজেপি বিরোধী অপপ্রচারের ফল হয়েছে উল্টো। মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক বিশেষ করে লোয়ার অসমের মুসলমান বহুল জেলাগুলিতে মুসলমানরা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকলেও অসমীয় প্রধান আপার অসম, হিন্দু বাঙ্গালি প্রধান বরাক ভ্যালি উজাড় করে ভোট দিয়েছে বিজেপিকে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা অসম সেন্টিমেন্টের চ্যাম্পিয়ন অসম গণপরিষদের। অসমের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হবে যে অসমের মানুষ শুধু এন আর সির পক্ষে নয়, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষেও ঢেলে জনমত দিয়েছে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনসমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়ে আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতার নামে অসমে বনধ ডাকছে, বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে।

বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা সরাসরি অসম গণপরিষদ ও আসুর দিকে আঙুল তুলে বলছেন অসমকে বাংলাদেশিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার দায় ওদেরই নিতে হবে। কারণ নাগরিকত্ব প্রদানের ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ করার প্রস্তাব ওরাই মেনে নিয়ে অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এই কুড়ি বছরে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশিকে নাগরিকত্ব প্রদান করে আজ অসমের জন চরিত্র পাল্টে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্ব বিল লোকসভায় পেশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন, অসমের মানুষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষায় গরিমা রক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই ঘোষণা যে ফাঁকা আওয়াজ নয় তা স্পষ্ট হলো কেন্দ্রীয় কেবিনেটের আরেকটি সিদ্ধান্তে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তই অহোম, কুচরাজবংশী, ছুটিয়া, মোরাং, মটক এবং চা বাগানের আদি বাসিন্দাদের এসসি/এসটির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

অসমের বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে দাবি করেন যে, যদি এখনই এই বিল পাশ করা না যায় তাহলে অসমের কম পক্ষে ১৭টি বিধানসভা আসনে জেহাদি মুসলমানরাই হয়ে উঠবে নির্ণায়ক শক্তি। তিনি আরও দাবি করেন যে অসমের নষ্ট হওয়া জনভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য হিন্দু বাঙ্গালিদের ডেকে এনে অসমে বসানো দরকার। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় মুসলিম লিগ অসমকে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিল। এখন মুসলিম লিগ না থাকলেও অনেক দল আছে যারা মুসলিম লিগের অসমাপ্ত কাজ হতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। হিমন্তর দাবি এন আর সি-তে বাদ পড়া চল্লিশ লক্ষের মধ্যে ৮ লক্ষের মতো বাঙ্গালি হিন্দু। এদের নাগরিকত্বের ব্যবস্থা না করে ফেরত পাঠালে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অসমে কাশ্মীরের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে।

গত ৮ জানুয়ারি আরেকবার প্রমাণ হলো বাঙ্গালি একটি আত্মঘাতী আত্মবিস্মৃত জাতি। এই দিন লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বিতর্ক হলো এবং বিলটি পাশও হয়ে গেল। বলার অপেক্ষা রাখে না এই বিল পাশ হলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে হিন্দু বাঙ্গালিরা। পশ্চিমবঙ্গ ও অসম মিলে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু বাঙ্গালি আছে যারা এই বিলের জন্য ভারতে অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারান্টি পাবে। এ দিন পশ্চিমবঙ্গের বড়ো অংশের মানুষের আবির নিয়ে উৎসবে মেতে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু না, বাঙ্গালিদের মধ্যে এই নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। হিন্দু বাঙ্গালিদের ভোটে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি এই বিলের বিরোধিতা করে বিতর্ক চলাকালীন সংসদ থেকে ওয়াকআউট করলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দল এই বিলের বিরোধিতা করার সাহস পাচ্ছে, কারণ চেতনাহীন বাঙ্গালিদের কোনো সামগ্রিক ভোটব্যাঙ্ক নেই। এখানেই শেষ নয়, মমতা ব্যানার্জির দল দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানের পক্ষে যারা ভোট দিয়েছিল সেই অনুপ্রবেশকারী মুসলমান সম্প্রদায় ও তাদের বংশধরদের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবিও তুললেন। একই পথ অনুসরণ করলো বাঙ্গালি হিন্দুর ভোটে চৌত্রিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করা বামপন্থীরা। না, এখানে কোনো মানবতা বা উদারতা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য নয়, মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েই যে তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থীরা অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবি তুলল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতেও ভারতের সংসদে পাশ হওয়া হিন্দু বাঙ্গালির যন্ত্রণা লাঘবকারী বিল পাশের সংবাদ গুরুত্বহীন ভাবে ছাপা হলো। ৯ জানুয়ারির বাংলা সংবাদপত্রগুলি হিন্দু বাঙ্গালির অন্ধকারাচ্ছন্ন চেতনাবোধের সাক্ষী হয়ে থাকল। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

অপপ্রচার, গুজব ও রাজনীতির খেলায় ফেঁসে রয়েছে নাগরিকত্ব পঞ্জিকরণ বিল

রাম মাধব

গত শতাব্দীর শেষ দশকের কথা। এ সময় অসমের অসম গণপরিষদ সরকার রাজ্যের ছ'টি জনগোষ্ঠী তই-অহোম, ছুটিয়া, মোরাং,মটক, কোচ রাজবংশী এবং চা-বাগানের আদিবাসিন্দাদের তপশিলি উপজাতি ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই বিল সংসদে খারিজ হয়ে যায়। পরে অন্য কোনো সরকার এর সংশোধনের কোনোরূপ প্রচেষ্টা করেনি। বর্তমানে অসমে সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বে বিজেপি সরকার এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করায় এই বিল আবার নতুন করে মানুষের সামনে এসেছে। রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র সরকারকে অবশ্য চিন্তাভাবনা করতে হবে। এই ছ'টি জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতি ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্প্রতি সংসদে পেশ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে খারিজ হওয়া প্রস্তাব এবার ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। যার ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের পর ওই ছয় জনগোষ্ঠী আশায় বুক বেঁধেছে। কিন্তু প্রথম থেকেই এ বিষয়ে অপপ্রচার করে এই জনগোষ্ঠীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তারা তপশিলি উপজাতি ঘোষিত হলে যে সুযোগ সুবিধা পায় তা আর পাবে না। কেননা অন্যদের সঙ্গে তা ভাগাভাগী হয়ে যাবে। আসলে এই অপপ্রচার পুরোপুরি ভিত্তিহীন। অসমে জনজাতিদের দুটি শ্রেণী রয়েছে। এক, সমতলীয় জনজাতি এবং দুই, পার্বত্য জনজাতি। নতুন এই ছয় জনজাতিকে এই দুয়ের কোনোটির মধ্যেই শামিল করা হবে না। এদেরকে 'নতুন জনজাতি' অথবা 'অন্য জনজাতি' রূপে নতুন শ্রেণী তৈরি করা হবে। এদের জন্য আলাদা ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। যদিও বিলটিতে এই বিষয়ে স্পষ্টতার বহু অভাব রয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, অতিরিক্ত কোটা এবং এর নামকরণ করা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই আশ্বস্ত করেছেন যে, বিলটি পাশ হলেই বর্তমান জনজাতিদের সুযোগ সুবিধা সুরক্ষিত করবে এবং নতুন জনজাতিদের জন্য কোটার ব্যবস্থা করা হবে। দুঃখের বিষয় হলো, এরকম জনহিতকর বিষয় নিয়ে দ্বিচারিতা ও অপপ্রচার আজ অসম-সহ পূর্বাঞ্চলের সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল নয়, মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম এমনকী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও এই অপপ্রচারের খেলায় মেতে উঠেছে।

অসমের মানুষের দীর্ঘদিনের জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণের দাবি পূরণ করার শ্রেয় যদি কাউকে দিতে হয় তাহলে তা অবশ্যই অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়ালের প্রাপ্য। এর ফলে ভারী সংখ্যায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার কঠিন কাজ সহজ হয়ে গিয়েছে। জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণের অতিরিক্ত অসম চুক্তির ৬ ধারাকেও সোনোওয়াল সরকার কেন্দ্র সরকারকে চালু করার জন্য রাজি করিয়েছে। ঐতিহাসিক অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার তিন দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু যে ধারায় এই চুক্তির মর্মার্থ নিহিত রয়েছে তা লাগু করতে আজ পর্যন্ত কোনো সরকার কোনো প্রকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অসম চুক্তির ৬ ধারায় রয়েছে— 'অসমীয় জনতার সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভাষাগত পরিচিতি এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও উৎসাহদানের জন্য যা কিছু সাংবিধানিক, আইনি ও প্রশাসনিক সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, তা সবই করা হবে।'

ভারতীয় জনতা পার্টি-সহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুপ্রাণিত বিবিধ সংগঠন অসম আন্দোলনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। অসম চুক্তি রূপায়িত করার আবশ্যকতাকে পূরণ করার পথে মোদী সরকার ইতিবাচক ভাবনার সঙ্গে ধারা ৬ কার্যকর করার পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এজন্য অসমের বিদ্বজ্জনদের এক সমিতি গঠন করেছেন। যাঁরা অসমবাসীর জন্য এই ধারার প্রভাবী ক্রিয়ান্বয়ণের জন্য বিলের সংরক্ষণ সহ সমস্ত বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ দান করবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির জন্য সমিতির কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করেছেন। তাসত্ত্বেও এই দিশায় অগ্রসর হতে দায়বদ্ধতায় কোনোরূপ শৈথিল্য আসেনি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পরামর্শ নিয়মিত ভাবে পেয়ে চলেছে।

নাগরিকপঞ্জি বিলের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গুজবের ভয়ানক রকমেরই অভিযান চালানো হচ্ছে। এই বিলের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকতা প্রদান করা। এই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা হলেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও খ্রিস্টান জনসমাজ যাঁরা নিজের দেশে ভয় অথবা অত্যাচারের কারণে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া ভারত আজও বিভাজনের দংশনজ্বালায় জর্জরিত। এই কারণেই পঞ্জাব, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের মতো রাজ্যগুলিতে সীমান্তের ওপার থেকে অত্যাচারিত মানুষের আসার ঢল অব্যাহত রয়েছে।

এ বিষয়ে দুশ্চিন্তা ব্যক্তকারী কিছু লোক বাস্তবিক সত্য তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কিছু লোক রাজনৈতিক ঘুঁটি সাজিয়ে তাদের নিজের দিকে ঝোলটানার খেলায় ব্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে নাগরিক-পঞ্জিকরণ বিল সমগ্র দেশের জন্য। কোনো এলাকা বা কোনো বিশেষ রাজ্যের জন্য সীমিত নয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, বিতাড়িত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভারত কখনো আশ্রয় দিতে ইতস্তত করেনি। তাদের সব সময় সাদরে গ্রহণ করেছে। সিরিয়ান খ্রিস্টান, পার্শি ও ইহুদিরা এখানে এসেছে, তাদের ও ভারত উদার হৃদয়ে গ্রহণ করেছে। এই নাগরিকপঞ্জি বিল সেই পরম্পরার প্রবহমানতাকেই সুনিশ্চিত করছে।

নাগরিকপঞ্জি বিলের দ্বিতীয় মর্মার্থ হলো, অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভারত কোনো ধর্মশালা নয়। যে কেউ এখানে এসে বসে যাবে তা আর হওয়ার নয়। বিলের ধারা অনুসারে নাগরিকত্ব কেবল তাঁরাই পাবেন যাঁরা ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বরের আগে থেকে এখানে শরণার্থী রূপে বসবাস করছেন। এটাই একমাত্র প্রমাণ নয়। আবেদনকারীর ভারতে সাত বছর ধরে বসবাস করার প্রমাণ থাকতে হবে। এর অর্থ হলো যদি কোনো ব্যক্তি ২০১৪ সালে ভারতে শরণার্থীরূপে আসেন তাহলে তাঁকে ২০২১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরকম লোকেদের ভারতের যে কোনো স্থানে বসবাসের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তৃতীয় হলো, জেলা প্রশাসন স্তরে আবেদনকারীর বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের শংসাপত্রের ভিত্তিতেই নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি এগিয়ে যাবে।

বর্তমানে অসমে গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে, নাগরিকপঞ্জি সংশোধন আইন ২০১৬-র ফলে বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি হিন্দু ও বৌদ্ধ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এসে বসে যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১.৪ কোটি হিন্দু ও কেবল ১০ লক্ষ বৌদ্ধ রয়েছেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমা সিল হওয়ার কারণে সুরক্ষিতও রয়েছে। বিলে এটাও স্পষ্ট যে, ২০১৪ সালের পরে যাঁরা ভারতে আসছেন তাঁরা নাগরিকত্ব পাওয়া যোগ্য নন। নাগরিকপঞ্জি বিল লোকসভায় পাশ হয়েছে কিন্তু রাজ্যসভায় এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠ না থাকায় পাশ হতে পারেনি। ভোটের রাজনীতির কারণে কংগ্রেস বরাবরই এই বিষয়ে রাজনীতি করে এসেছে। ২০১৫ সালে অসমে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে কংগ্রেস বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু ও বৌদ্ধদের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবি তুলেছিল। সেই দলই আজ ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে সেই লোকদের জন্য মানবিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করে চলেছে। এদের দোসর হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস।

■

উচ্চবর্ণের সংরক্ষণে মোদী প্রমাণ করলেন তিনি প্রচলিত নিয়ম ভাঙতে পারেন

সুজয় চট্টোপাধ্যায়

পাশ হয়ে গেল উচ্চবর্ণের জন্য শিক্ষা ও চাকরিক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বিল। বিলটি লোকসভাতে পাশ হলেও সন্দেহ ছিল যে রাজ্যসভাতে পাশ হবে কিনা। কিন্তু সমস্ত জল্পনা-কল্পনা, বাধা-বিপত্তি এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে বিলটি পাশ হলো এবং এর সঙ্গে ঘটে গেল এক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব। সামাজিক বিপ্লব কারণ সকল ব্যর্থতার জন্য ভারতের উচ্চবর্ণের দোষ ধরা কিছু দলিত ও বামপন্থী সংগঠনের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজনৈতিক বিপ্লব কারণ ভারতের তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে. থেকে উত্তরপ্রদেশের মায়াবতীর বি.এস.কে.— সবার ভোটব্যাঙ্ক সংগঠিত ও সুরক্ষিত ছিল 'উচ্চবর্ণ বিরোধী' রাজনীতির ওপর। সেই মিথ ভেস্তে গেল। ভয়ে ভয়ে আছে অন্য প্রাদেশিক দলগুলি যারা মায়াবতী বা করুণানিধির

মতো সরাসরি কিছু বলেনি বা বলতে সাহস পায়নি পাছে উচ্চবর্গের ভোটব্যাঙ্ক 'বিলের বিরোধিতা' করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

আসলে ভারতের রাজনীতির এই কৌশল আজকের নয়, বহু পুরোনো এবং বহু সযত্নে ও ষড়যন্ত্রে লালিত। বিপ্লবী আন্দোলন বা অগ্নিযুগের সময় থেকে ব্রিটিশদের যে পরিকল্পনা ছিল উচ্চবর্ণকে ভারতের সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করা ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই দক্ষিণে দ্রাবিড় আন্দোলনের উত্থান, মহারাষ্ট্রে দলিত আন্দোলনের উত্থান, বাংলার বরিশালে যোগেন মণ্ডলের উত্থান এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সোশালিস্ট লবির উত্থান। এই রাজনৈতিক ধারাগুলির পেছনে ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টি ও পরবর্তীকালে লেবার পার্টির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত ছিল।

পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে ব্রাহ্মণবিরোধী দ্রাবিড় আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় এআইএডিএমকে এবং ডিএমকে। দলিত আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাগুলি মিশে যায় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলে। যার ফলে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল হয়ে দাঁড়ায় উচ্চবর্ণ বিরোধী। উচ্চবর্ণকে দোষারোপ ও আক্রমণ করাই একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক ফ্যাশনে পরিণত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুসলমান তোষণের রাজনীতি। ফলে দলিত ও মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক যে পার্টির আছে, তাদের কাছে সবাই আসবে। এটা ধরে নিয়েই এতদিন ভারতের রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে। দলিতদের উন্নয়ন না করে তাদের খেপিয়ে তোলা হয়েছে যাতে ভোটের সময় কাজে লাগে। দলিত ইস্যুটাকে জিইয়ে রেখেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে। কারণ এই ইস্যুকে জিইয়ে রাখালেই ক্ষমতা দখলের পথ সহজ হবে।

কিন্তু গত ২০ বছরে ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন আসে। ঠিক একই সময় রামজন্মভূমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন আসে। দলিতরা উপলব্ধি করতে শুরু করে যে সেকুলার দলগুলি তাদের ভুল বুঝিয়েছে। মুসলমানদের সঙ্গে থাকার থেকে হিন্দুদের সঙ্গে থাকলেই তাদের বেশি লাভ। যোগেন মণ্ডল যে ভুল করেছিলেন তা অনেকেই উপলব্ধি করতে শুরু করেন।

কিন্তু দলিত ভোটব্যাঙ্কের ভাঙন হলেও ভারতে কিন্তু স্বাধীনতার আগে যে জাতীয়তাবাদী হাওয়া ছিল তা ফিরল না। কারণ ততোদিনে উচ্চবর্ণ ও দলিত দুটি আলাদা মেরু তৈরি হয়েছে। দলিতরা সংরক্ষণ পায়, এসসি/এসটি, ওবিসি-রা সংরক্ষণ পায়, সুযোগ সুবিধা পায়, চাকরিক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে। কিন্তু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, কায়েত, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছেলেমেয়েরা মেধা থাকলেও সুযোগ পায় না। এই ক্ষোভ সর্বত্র কাজ করেছিল।

এটি অনেকটা বাঙ্গালির ঘটি-বাঙাল বিবাদের মতো। যাকে ইন্ধন দিয়েছিল কংগ্রেস এবং সিপিআইএম। এই ক্ষোভ বা বৈষম্য ভেঙে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার একটি পদক্ষেপ হতে পারত 'কোটা' সিস্টেমটাকেই তুলে দেওয়া। কিন্তু ভারত যে আজও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ, তাই তা সম্ভব হয়নি। পূর্বতন সরকারগুলির ইচ্ছা বা সাহস কোনোটাই ছিল না। কিন্তু সেই সাহস দেখালেন মোদী, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে উচ্চবর্ণরাও মানুষ এবং হিন্দু সমাজের অংশ। উচ্চবর্ণেরও অধিকার আছে সবার সঙ্গে সমান অধিকারে শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ নেওয়া।

১০ শতাংশ সংরক্ষণের বিলটি পাশ হওয়ার পরেও অনেকে বিরেধিতা করেছেন এবং এখনও করছেন তাতে বিলটি আটকে থাকেনি। যেমন আটকে থাকেনি অসমে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা বা রামজন্মভূমি পরবর্তী সময়ে বিজেপি-র উত্থান। যারা জাতপাত ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি করেন, তারা যত তাড়াতাড়ি দেশের মূলস্রোতে মিশে যান, ততই তাদের মঙ্গল। ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গড়ার লক্ষ্যে এটি মোদী সরকারের একটি সাহসী পদক্ষেপ। ■

চীনে তিন দশকের মধ্যে নিম্নতম আর্থিক বৃদ্ধি

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

একথা সবাই স্বীকার করবেন মোদী সরকার বিরাজমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই কর্মকুশলতাকে বৃদ্ধি করে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করেতে চলেছেন। ভারতের সঙ্গে প্রতি তুলনায় চীন মেধাসম্পদের উপর গুরুত্ব দিয়ে কত বেশি অগ্রসর হয়েছে সে ব্যাপারে গুরুচরণ দাশ বলেছেন যে, উচ্চস্তরের শিক্ষার সঙ্গে মেধাভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা এক প্রজন্মের মধ্যে ফলদায়ক হয়। চীন তাই করে দেখিয়েছে। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে, ২০১৮ সালে চীনের বৃদ্ধির হার বিগত তিন দশকের মধ্যে নিম্নতম হতে চলেছে। চতুর্থ ত্রৈমাসিকীর ফলাফলের নিরিখে বলা যায় চীনের অর্থনীতি ঝিমিয়ে পড়েছে এবং এর কারণ হিসাবে নিম্নমুখী অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং পীড়াদায়ক আমেরিকান শুল্কনীতিকে দায়ী করা হচ্ছে। আরও পতন রুখতে চীন সরকারকে অধিকতর আর্থিক উৎসাহ জোগাতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চীন বিশ্বের মোট আর্থিক বৃদ্ধির এক-তৃতীয়াংশ জুগিয়েছে। আজ সেই দেশের দুর্বলতার ক্রমবর্ধমান চিহ্নগুলি বিশ্ব অর্থনীতির পক্ষেও ঝুঁকিপূর্ণ, তা আমেরিকা ও ভারতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বিশ্বের বৃহৎ গাড়ি উৎপাদনকারীদের ও অ্যাপলের মতো আমেরিকান সুবৃহৎ কোম্পানিকেও ইতিমধ্যে জোর ধাক্কা দিয়েছে। চীনের নীতিনির্ধারকরা অত্যধিক চাকরি খোয়ানোর আশঙ্কায় অধিকতর সরকারি সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু তাঁরা একেবারে প্রতিশ্রুতির বান বইয়ে দেবেন না তাও বলেছেন। অতীতে চীন এরকম করতে গিয়ে বৃদ্ধির হার দ্রুত বেড়েছিল কিন্তু একই সঙ্গে ঋণের পাহাড় চাপিয়েছিল।

টোকিয়োর দাইওয়া ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ-এর প্রধান নাওতো সাইতো বলেছেন— ''অর্থনীতিকে সহায়তা দেওয়ার উপায় সরকারের আছে। তারা পরিকাঠামো ব্যয় বাড়াতে পারে এবং ব্যাঙ্কের রিজার্ভ রেশিও কমাতে পারে। সুতরাং মূলধনী ব্যয় বাড়ানোর জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই।'' কিন্তু পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ে সমস্যা আছে। বেতন বৃদ্ধির কারণে পণ্যবিক্রয় ঠিক আছে তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা হতাশা কাজ করছে।

ডিসেম্বর ২০১৮-র শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকীর বিবরণ অনুসারে জিডিপি দাঁড়িয়েছে ৬.৪ শতাংশ যা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়ের পর থেকে সবচেয়ে কম। আশঙ্কা হচ্ছে ১৯৯০-এর পরে এই প্রথম ২০১৮-এ জিডিপি হবে ৬.৬ শতাংশ, ২০১৭-তে যা ছিল ৬.৮ শতাংশ। সহায়ক ব্যবস্থা কার্যকর হতে কিছু সময় লাগবে। অতএব বিশ্লেষকদের মতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে এবং জিডিপি দাঁড়াবে ৬.৩ শতাংশ। চীন পর্যবেক্ষকদের মতে প্রকৃত অবস্থা সরকারি তথ্যের থেকেও খারাপ।

অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে। কারখানার উৎপাদন ৫.৪ শতাংশ থেকে ৫.৭ শতাংশ হয়েছে। এর সঙ্গে পরিষেবা ক্ষেত্র জোরালো হয়েছে। এর কারণ নির্মাণ শিল্প, খনিজ ও তেল উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু ইস্পাত উৎপাদন মার্চের পর একেবারে তলানিতে ঠেকেছে, তাতে লাভ ক্রমশ কমে আসছে। এ সত্ত্বেও চীন বায়ুদূষণের উপর কড়া পদক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে। আর তা শিল্পের উপর মারাত্মকভাবে ছাপ ফেলেছে। ২১ জানুয়ারি প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুসারে বিনিয়োগ ও খুচরো বিক্রয় একনাগাড়ে মন্দার সম্মুখীন হয়েছে। ফলে কর্মহীনতা বেড়েই চলেছে। ২০১৮-তে স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ মাত্র ৫.৯ শতাংশ বেড়েছে বিগত বাইশ বছরে যা সবচেয়ে কম। কারণ স্থানীয় সরকারগুলি ঋণের উপর কড়াকড়ির ফলে খরচ কমিয়েছে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ নড়বড়ে। কারণ সরকার গৃহঋণ কমিয়ে দিয়েছে। উপভোক্তা ক্ষমতা ১৫ বছরে সবচেয়ে খারাপ। গাড়ি বিক্রি ১৯৯০-এর পর কমে ন্যূনতম হয়েছে। মনে রাখতে হবে, চীন গাড়ির সবচেয়ে বড়ো বাজার। সরকার গাড়ি ও অন্যান্য বড়ো উপকরণের মতো পণ্যসমূহ উপভোক্তাদের জন্য বাড়াতে চাইলেও আয় কমছে আর গৃহঋণের বোঝা বেড়েছে।

অন্যান্য তথ্য দেখাচ্ছে আমদানি ও রপ্তানি গত মাসে অপ্রত্যাশিত ভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে। আর কারখানাজাত দ্রব্যের জন্য নিম্নমুখী বায়না ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আগামীতে তা আরও কমবে ও ছাঁটাই বাড়বে।

বিশ্ব জুড়ে চাহিদা কমছে। আমেরিকাতেও। চীন-আমেরিকা আসন্ন বৈঠক কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদি হয়ও চীনের রপ্তানি কোনো মতেই বাড়বে না। গত বছরে শুধু রপ্তানির কারণে বৃদ্ধির হার ৮.৬ শতাংশ কমেছিল। আমেরিকা সতর্ক করেছে যদি বৈঠকে ঐক্যমত্য না হয় তা হলে পণ্য মাশুল আরও বাড়বে। ইতিমধ্যে ইউরোপের বাজারে শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করেছে।

চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাঁচা তেল আমদানিকারক দেশ। সেই কারণে যে মুহূর্তে চীনের অর্থনীতি পড়তে শুরু করেছে সোমবার (২১ জানুয়ারি, ২০১৯) অমনি বিশ্ব বাজারে শেয়ার দর নেমে গেছে। সিএমসির মুখ্য বাজার বিশ্লেষক মাইকেল হিউসন বলেছেন, গত দশ বছরে চীন যে গতিতে বেড়েছে পরবর্তী দশ বছরে তা সম্ভব নয়। তারা আরও বলেছেন, চীনের বর্তমান অবস্থার জন্য তিনটি কারণ দায়ী— চীনসহ বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, ক্রমবর্ধমান মার্কিন সুদের হার, চীন-মার্কিন বাণিজ্য লড়াই এবং মোবাইল ফোনের পড়তি চাহিদা। ডিসেম্বর মাসে চীনের আমদানি হ্রাসের ৭০ শতাংশ এই কারণে ঘটেছে। উপভোক্তারা দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত, কর্পোরেটগুলির ঋণও খুব বিশাল, স্থানীয় সরকারগুলো ঋণে জর্জরিত, কাজেই সরকার যতই ত্রাণ দিক না কেন তা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা দেখার আছে। ■

মাথাভাঙ্গায় শিক্ষক সঙ্ঘের কর্তব্যবোধ দিবস উদ্‌যাপন

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ অনুমোদিত বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং বঙ্গীয় নবউন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৩ জানুয়ারি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা ঝংকার ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় কর্তব্যবোধ দিবস উদ্‌যাপন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ জানুয়ারি থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি এই পক্ষকালে কর্তব্যবোধ দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক সাধন কুমার পাল, স্বপন সিংহ, চন্দন কুণ্ডু, সুমন কর্মকার প্রমুখ।

সংগঠনের মাথাভাঙ্গা মহকুমা সভাপতি দীপক বর্মন জানান, অন্য শিক্ষক সংগঠনগুলি যেখানে শুধুমাত্র শিক্ষকদের প্রাপ্য আর পেশাগত স্বার্থ নিয়ে শুধুমাত্র মিটিং মিছিল করে সেখানে আমাদের শিক্ষক সংগঠন সেগুলির পালাপাশি শিক্ষকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এখানেই আমাদের শিক্ষক সংগঠনের মৌলিকত্ব। অনুষ্ঠানে ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধা'র নবম বার্ষিক অনুভবী সম্মেলন

বীরভূম জেলার প্রখ্যাত সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা'র নবম বার্ষিকী অনুভবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২০ জানুয়ারি সিউড়ির সরোদিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে। শ্রদ্ধার পাঁচজন প্রবীণ অনুভবী – সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. রণজিৎ বাগ, সিউড়ি বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের পূর্বতন অধ্যক্ষ ড. মহাদেব চন্দ্র, ড. রামকৃষ্ণ মণ্ডল ও শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু একযোগে প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন। প্রথমেই শ্রদ্ধার অনুভবী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

যাঁরা এক বছরের মধ্যে স্বর্গগত হয়েছেন তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। প্রথম পর্ব সঞ্চালনা করেন শ্রদ্ধার সহ সম্পাদক জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়। বিগত বছরের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন লক্ষ্মণ বিষ্ণু। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবদন পাঠ করেন বিশ্বনাথ দে। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শ্রীমতী কাকলি দাস বেশ কয়কটি সমগীত পরিবেশন করেন। শ্রদ্ধার পক্ষ বক্তব্য রাখন শিক্ষিকা শ্রীমতী চৈতালি মিশ্র। এছাড়া, ১৫ জন অনুভবী তাঁদের অনুভবের কথা বর্ণনা করেন। শ্রীমতী অলকা গাঙ্গুলি ও রতন কাহার দুটি করে সংগীত পরিবেশন করেন। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় পর্ব সঞ্চালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়।

দিনহাটায় পরিবার প্রবোধনের বনভোজন

গত ১২ জানুয়ারি কোচবিহার জেলার দিনহাটা নগরে পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে এক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। ২১০ জন অংশগ্রহণ করেন। পরিচালনা করেন দেবব্রত ঘোষ।

পাণ্ডুয়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রক্তদান শিবির

গত ১৩ জানুয়ারি হুগলী জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে পাণ্ডুয়া তারাপদ ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হুগলী জেলা সভাপতি সত্যভূষণ পাঠক, সম্পাদক দীপঙ্কর রায়, সহ সম্পাদক তপন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য, আনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ শর্মা, মানস দাস প্রমুখ। শিবিরে ৪৮ জন রক্তদান করেন। কলকাতার 'লাইফ কেয়ার' সংস্থা রক্ত সংগ্রহ করে।

মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠানোর দরকার নেই : হেফাজত-এ-ইসলাম

বাসুদেব ধর

হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফির মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের জেরে দেশজুড়ে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো চলছে। তোলপাড় হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গন কারণ সংগঠনটি ক্ষমতাসীন দলের আশীর্বাদধন্য। বলা হচ্ছে, এ বক্তব্য নারীবিদ্বেষী, স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী ও সংবিধানবিরোধী। শফির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। হেফাজতে ইসলাম প্রধান চট্টগ্রামে হাটহাজারিতে দারুল উলুম মইনুল ইসলাম মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে এক সমাবেশে মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, পাঠালেও চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শ্রেণীর বেশি পড়ানোর প্রয়োজন নেই। স্বামীর টাকা-পয়সার হিসেবপত্র রাখা ও স্বামীর কাছে চিঠি লেখার জন্যে এইটুকু শিক্ষাই যথেষ্ট। তিনি আরও বলেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াতে চাইলে বোরখা পরতে হবে। তাদের শিক্ষকও হতে হবে মহিলা।

হেফাজত আমিরের এ ধরনের বক্তব্য নতুন নয়, মাত্র দু'বছর আগে হেফাজতে ইসলামের পরামর্শে স্কুলের পাঠ্যসূচি ইসলামিকরণ করা হয়। হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের লেখা বাদ কিংবা কাটছাঁট হয়। এমনকী রবীন্দ্রনাথের লেখাও কাটছাঁট করা হয়। হেফাজত পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামিকরণের দাবি জানাচ্ছে। সম্প্রতি সরকার কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস সনদকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এজন্যে হেফাজতের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা জানানো হয় ঢাকায় সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। এই সংবর্ধনা সমাবেশ থেকে শেখ হাসিনাকে 'কওমি জননী' উপাধি দেওয়া হয়। হেফাজতের ইতিপূর্বেকার ১৩ দফায় নারী নেতৃত্ব হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্ব তারা গ্রহণ করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শফি ও হেফাজতের শীর্ষ নেতারা ছবিও তুলেছেন। উল্লেখ্য, মার্কিন কংগ্রেসে সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামি ও হেফাজতে ইসলামসহ উগ্রবাদী ইসলামি দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা ও গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মহসিন মন্টু এক বিবৃতিতে বলেন, আহমদ শফি নারী বিদ্বেষী, স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী ও সংবিধান বিরোধী। এই ফতোয়াবাজ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান তাঁরা। সাবেক তদারকি সরকারের উপদেষ্টা, বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল বলেছেন, আহমদ শফি যে বক্তব্য রেখেছেন, তা সরাসরি সংবিধান বিরুদ্ধ। কেউ সংবিধানবিরোধী কথা বললে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কোনও না কোনও নীতি আছে। এক্ষেত্রে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে, আমরা দেখতে চাই।

সদ্য বিদায়ী তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু এম পি বলেছেন, শফির বক্তব্য ইসলামবিরোধীও। ইসলামে কোথাও নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো কথা নেই। আহমদ শফিরা দেশ ও সমাজকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যেতে চান। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারীপক্ষ, জাতীয় নারী জোট, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম-সহ বিভিন্ন নারী সংগঠন দাবি জানিয়েছে, আহমদ শফিকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম বলেন, নারীরা যখন সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে, এমসময় এ ধরনের বক্তব্য দেওয়ার স্পর্ধা শফি কাথায় পেলেন দেশের মানুষ জানতে চায়।

নারী শিক্ষা নিয়ে হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফির বক্তব্য সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের প্রেক্ষাপটে সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলেন আইনমন্ত্রী আনিজুল হক। তিনি বলেন শফি সাহেব একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। তাঁকে শ্রদ্ধাভরে বলতে চাই, তাঁর এসব বক্তব্য দেশের ইতিবাচক উন্নয়নের বিপরীতে যাবে। তাই এই বক্তব্য পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। আইনমন্ত্রী আরও বলেন, শফি সাহেব যা বলেছেন, সেটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। শেখ হাসিনার সরকার নারী অধিকারের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেটা আরও দৃঢ় হবে এবং আরও এগিয়ে যাবে। এটাই এই সরকারের নীতি ও বিশ্বাস। আইনমন্ত্রী কথা বললেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু জামায়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে যেভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেন সেভাবে এগিয়ে আসেননি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে দু' একজন বলেছেন, জামায়াত ও হেফাজত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কিন্তু যেহেতু এখন হেফাজতে শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ নির্মূলে জিরো টলারেন্সের কথা বলেন সবসময়। চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর এই কথাটি আরও জোরালোভাবে উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, হেফাজতে ইসলামের মতো জঙ্গি দলকে পাশে রেখে জঙ্গিবাদ নির্মূল করবেন কীভাবে? আমেরিকা সে প্রশ্নটিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ■

নরেন্দ্র মোদীকে এত ভয় কেন?

শ্যামল কুমার হাতি

রাজনীতি অতি পবিত্র জিনিস। দেশ আমাদের মা। এ ব্যাপারে সবাই একমত। দুঃখের কথা, আজ ভ্রষ্ট কিছু নেতার জন্য সেই রাজনীতি কলুষিত। তবু সবাই চিৎকার করছে। চাকুরি সবার চাই। তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। ভালো, বিরোধীদের কেন কেউ প্রশ্ন করছেন না? জানি নিজেদের তো কেউ প্রশ্ন করে না। ১৯ জানুয়ারি ব্রিগেডে যারা এসেছিলেন তারা তো সবাই একে অপরের আত্মীয়। তাই আর প্রশ্ন নেই সেখানে। ভালো কথা। ১৯-এ যারা ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার কাণ্ডারি, তাদের কাছে একজন সাধারণ দেশবাসী হিসাবে আমার প্রশ্ন, সোনিয়া, মায়াবতী, মুলায়ম, লালুপ্রসাদ এদের তো হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি, দেশবাসী সব জানেন। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হতেই সবার সম্পত্তি কত তা দেশবাসী জানতে পেরেছে।

রাহুল গান্ধী ও সোনিয়াকে তো ইনকাম ট্যাক্স দপ্তর থেকে কয়েকশো কোটি টাকার ট্যাক্স ফাঁকির নোটিশ দেওয়া হয়েছে। মা-ছেলের অর্থনৈতিক অপরাধের চার্জশিট জমা পড়েছে। তাঁরা জামিনে মুক্ত আছেন মাত্র। অরবিন্দ কেজরিওয়াল, শত্রুঘ্ন সিংহ, অরুণ শৌরী, যশবন্ত সিংহ, মমতা ব্যানার্জি বা স্ট্যালিন-চন্দ্রবাবুদের মনে কি প্রশ্ন জাগেনি? কী ব্যবসা করতেন মায়াবতী, মুলায়ম, লালু, সোনিয়া, রাহুল? তাঁদের কেন হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা? কোথা থেকে এল এত টাকা? তার উৎস কী? না, সেই প্রশ্নের উদয় হয়নি। বাংলায় একটা কথা আছে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। এটাও কি তাই? কী ভাবেন দেশের মানুষ কে? সবাই বোকা? ভয় দেখিয়ে কলকাতা-হাওড়া ও শহরতলীর টোটো বন্ধ করে সবাইকে ব্রিগেডমুখী করা হয়েছে। সব বাস তুলে নেওয়া হয়েছিল। ফুটপাথে ব্যবসা করে যারা তাদেরও জোর করে হুমকি দিয়ে ব্রিগেড নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঢালাও ডিম-ভাত খাইয়ে বাংলার মানুষকে কাঙাল প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাতে ও কি শেষ রক্ষা হবে দিদিভাই? আপনাদের দিল্লি জয় অলীক কল্পনা মাত্র। বাঙ্গালি কল্পনাপ্রবণ। কল্পনায় অনেক দূরে যাওয়া যায়। তাতেই দিল্লি যেতে হবে আপনাদের। নরেন্দ্র মোদীর উপর ইউনাইটেড

ইন্ডিয়ারক কাণ্ডারিদের রাগ তো? কেন রাগ দিদি? কেন সাংবাদিক সুমনের গ্রেপ্তারের সংবাদ ভালো করে পরিবেশিত হলো না? এর জন্য কার অবদান? সব সামনে আসবে। মোদীজী সব বের করছেন, আবার ক্ষমতায় ফিরলে আরও বোরোবে। সুমন চুপ থাকবে না, সব বলতে বাধ্য হবে। আসল ভয় তো সেখানে। কি দিদিভাই, তাই তো? নরেন্দ্র মোদীকে আপনাদের বড়ো ভয়। তাঁকে হঠাতে হবে। কিন্তু আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কে হবে সেটা বলুন।

ব্রিগেডের সভায় আপনার নাম কেউ বলেনি। লালুপুত্র তেজস্বী যাদব বলেছে কংগ্রেস বড়ো দল তারাই নেতৃত্ব দেবে। মায়াবতী- অখিলেশ মুচকি হাসছে। তাহলে এ কেমন ইউনাইটেড ইন্ডিয়া? আসলে এক শ্রেণীর বৃদ্ধ অসহায় নেতারা তাদের সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তার সঙ্গে কিছু আর্থিক অপরাধীরা তাল ঠুকছে। তাই তো গর্ব করে বলা হচ্ছে ২০১৯ মোদী ফিনিশ। দারুণ দারুণ! চালিয়ে যান দিদিভাই। আপনার তুলনা নেই। ব্রিগেডে কেন বললেন না আপনার ২ টাকা কিলো চালের কথা? তাহলে তো সব ফাঁস হয়ে যেত। যে চাল বাংলার গরিব মানুষ দু'টাকায় কেনে তাতে মোদী কত টাকা দেয় আর দিদি কত টাকা দেয় তার হিসাব টাঙিয়ে দিন না। রোজ রোজ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো নিয়ে বলেন, আপনার আচরণ কি যুক্তরাষ্ট্রীয় সুলভ? মোদীর সরকার তো কোনো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন পিছিয়ে দেননি। রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের সরকার বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে। তাতে তো আপনি খুবই আনন্দিত। তাহলে আপনি কেন হাওড়া কর্পোরেশন নির্বাচন বন্ধ রাখলেন? হাওড়ার মানুষ অসুবিধায় পড়েছে। আপনি কি গণতান্ত্রিক?

বাংলায় কথা আছে, চোরের মায়ের বড় গলা। ১৯ তারিখের সভায় তো ফিল্মি ভাষায় বলতে গেলে 'চোর মাচায়ে শোর' হলো। আমার কথা নয় এটা জনগণ বলছে। কী সুন্দর যুক্তি দিদিভাই আপনাদের! ইভিএম খারাপ। ইভিএম চোর। ইভিএমের ভিতর মোদীর ভেলকি আছে। এই সব কথা বলছেন আপনারা। তাই ব্যালট চাইছেন। কই তিন রাজ্যে বিজেপির পরাজয়ের পর আপনারা কিছু বলেননি? বিজেপি জিতলে ইভিএম চোর আর বিজেপি হারলে ইভিএম সাধু। চমৎকার দ্বিচারিতা, লোকে তো ধরে ফেলেছে দিদিভাই। কান পাতলেই শোনা যায় এদের হাতে দেশটা পড়লে কী হবে! আসলে মোদীজীর ভারতকে আপনাদের ভীষণ ভয়। ভারত আজ একটি শক্তিশালী দেশ। মোদীজীর ব্যবস্থাপনায় আজ পাকিস্তান অর্থনৈতিক পঙ্গু। কাশ্মীর সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গিরা পূর্বের ন্যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। আপনার ভাষাতেই বলতে গেলে জঙ্গিরা বর্ডারে হচ্ছে ফিনিশ। চীনও আজ আতঙ্কিত। পাকিস্তান, চীন কোনোমতেই চাইছে না, মোদীজী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হোন। এক শক্তিশালী ভারত হোক এরা কেউ চায় না। আপরনাদের ইচ্ছাটা কী এবার আপনারাই বলুন! আমরা তো দেশটাকে 'মা' বলি। তাই বড়ো চিন্তা হচ্ছে। ■

শুধু সংবাদপত্র নয়, সমস্ত মাধ্যমকেই নিয়ন্ত্রণ করছে শাসক দল

গত ৭ জানুয়ারি 'চিঠিপত্র' বিভাগে দেবাদিব্রত সেনের 'সংবাদপত্রে আশাভঙ্গ' শিরোনামে প্রকাশিত চিঠির প্রেক্ষিতে আমার এই পত্রের অবতারণ। আমার মতো শত শত মানুষের মনের কথা লিখেছেন দেবাদিব্রতবাবু। তবে তাঁর মতো কাগজ কেনা বন্ধ করিনি কিন্তু কোনো কাগজের পাঠক হয়ে উঠতে পারছি না। ইদানীং বহুল প্রচারিত বলে পরিচিত আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান, এই সময়, এমনকী যুগশঙ্খও অর্ধসত্য ও মিথ্যার বেসাতি করতে শুরু করেছে। শাসকের তাঁবেদারি ও স্তাবকতায় প্রথমস্থান পাওয়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত তারা। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার পরিবর্তে, সাদাকে সাদা দেখানোর বদলে শাসক সরকারের পদলেহন করতে করতে এখন তাদের জিহ্বা খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

শুধুমাত্র সংবাদপত্র নয়, খবরের চ্যানেল, প্রেস ক্লাব, নন্দনের মতো প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বকলমে নিয়ন্ত্রণ করছে নীল-সাদার বন্দনাকারীরা। সাংবাদিক ও সম্পাদকদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে সরকার বিরোধী আর্টিকেল না ছাপতে বা লিখতে। শাসকশ্রেণীর নেতা-নেত্রীর করস্পর্শ করে ও তাঁদের অনুমতিক্রমে চ্যানেলে খবর পরিবেশিত হয়। খবরের বিষয়বস্তুও মন স্পর্শ করতে পারে না। তাতে না আছে কোনো দৃঢ় প্রতিবাদী প্রতিবেদন। পরিবর্তে পাই শুধু ভণ্ড সেকুলার অবস্থান। তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ভণ্ডামি আর মোদী সরকার বেকায়দায় মার্কা শিরোনামের পর শিরোনাম দিয়ে অসত্য ও অর্ধসত্যের প্রচার যা জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়ায়। সত্যিই এটা বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতির দিক দিয়ে ক্ষতিকারক প্রবণতা যা বাঙ্গালির জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পরিপন্থী

'সংবাদপত্রে আশাভঙ্গে'র পরিত্রাতা হিসাবে এখন আমার প্রাণের পত্রিকা হয়ে উঠেছে এই জাতীয়তাবাদী বাংলা সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'। তাই দেবাদিব্রত সেনের মতো স্বস্তিকার কাছে আমারও অনুরোধ আপনারা একটি দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশ করুন যা লুটিয়েনি সাংবাদিকদের মুখে ঝামা ঘষে দেবে।

—অরুণ কুমার বসু,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

হায়, দেশপ্রেম!

সকালে কাগজ খুললেই দেখি শুধু ক্ষমতার লড়াই। ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি যাওয়া, নানান প্রতিশ্রুতি। জিতে গিয়ে অন্যরূপ। দেশপ্রেম নেই, দেশবাসী'র প্রতি টান নেই, শুধু ক্ষমতার লোভ। নানান দুর্নীতির খবর। তদন্তের জন্য ডাক। দেশের প্রতি, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা এতটুকু নেই। ভেবে অবাক হই।

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

রেললাইনের পাশে খেজুর গাছ রোপণ : বিপুল সম্ভাবনা

আমি আশি পার হয়েছি। বাল্যে, কৈশোরে ও কিছুটা যৌবনেও ফরিদপুরের খাঁটি খেজুর গুড় প্রচুর খেয়েছি। তার স্বাদ-গন্ধ এখনও ভুলিনি। বর্তমানে সেই খাঁটি বস্তু আর নেই। তাঁর প্রধান কারণ— জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খেজুর গাছের সংখ্যাল্পতা হেতু চাহিদা ও জোগানের অসামঞ্জস্য, ব্যবসায়ীদের অসাধুতা ও বিবেকহীন ভেজালের প্রয়োগ।

এই সমস্যা সমাধানে আমার একটি প্রস্তাব— রেললাইনের উভয় পাশে 'স্টেশন লিমিটের' বাইরে যথাযথ দূরত্বে খেজুর গাছ লাগানো। ভারতীয় রেললাইনের মোট দৈর্ঘ্য, লাগানো খেজুর গাছের সংখ্যা, উৎপাদিত গুড়ের পরিমাণ, তাতে বেকার সমস্যা কতটা সমাধান হবে ইত্যাদি হিসাবে না গিয়েও সহজেই বলা যায় এই কর্মকাণ্ডে পাটালি গুড়ের সুলভতা নিঃসংশয়ে বৃদ্ধি পাবে।

অন্যান্য গাছের তুলনায় খেঁজুর গাছ ঝড়ে কম পড়ে। ট্রেন চালকের দৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না বললেই চলে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও সরকার উদ্যোগ নিয়ে খেজুরগাছ লাগানোর ব্যবস্থা স্থানীয় পঞ্চায়েত, পৌরসভা, সমাজসেবী সংগঠন ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে খুব সহজেই করা যায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে বহুমুখী কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে।

—কমলাকান্ত বণিক,
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

তথ্য প্রযুক্তিতে নজরদারি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, দেশের যে কোনও স্থানে, যে কোনো সময় এবং যে কোনো কম্পিউটারে ১০টি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে নজরদারি চালানোর ক্ষমতা দেওয়া হলো। কেন্দ্রের এই নির্দেশিকার ফলে ওই ১০টি সংস্থা যে কোনও কম্পিউটারে নজরদারি চালানোর ক্ষমতা পেয়েছে। অবশ্য ইতিপূর্বে মোবাইল কল ও ই-মেলের 'ডেটা'র উপর নজরদারি চালানোর ক্ষমতা ছিল তদন্তকারী সংস্থাগুলির। কিন্তু এবার ওগুলির সঙ্গে কম্পিউটারে রাখা তথ্যও খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা পেয়েছে সংস্থাগুলি। এখন থেকে কম্পিউটার ও ওইসব বৈদ্যুতিন যন্ত্রে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার রাখা কোনো তথ্য ওই তদন্তকারী সংস্থাকে দেখাতে বাধ্য থাকবে। দেখাতে অস্বীকৃতি জানালে হবে জরিমানা বা ৭ বছরের কারাদণ্ড।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতের

সার্বভৌমত্ব, সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা ও বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষার স্বার্থেই এমন সিদ্ধান্ত। অথচ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় বিরোধীরা বিশেষত কংগ্রেস থেকে তৃণমূল, কমিউনিস্ট থেকে সমাজবাদী, চিলচিৎকারে গগন বিদীর্ণ করেছে। সবারই মুখে গেল গেল রব। কংগ্রেস বলেছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জনগণের মৌলিক অধিকার। তাই কেন্দ্রের এই নির্দেশিকা সেই স্বাধীনতার পরিপন্থী। কেন্দ্র জনগণের সেই অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তৃণমূল নেত্রী তথা এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তো কেন্দ্রের কাছে রয়েছে। নতুন করে নির্দেশ জারি করে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করার অর্থ কী? সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরির বক্তব্য, ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের সঙ্গে অপরাধীর ন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রের এই নজরদারি সংবিধান বিরোধী। সমাজবাদী নেতা রামগোপাল যাদব নির্দেশিকাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রকে হুঁশিয়ার দিয়ে বলেছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদী সরকারের এহেন পদক্ষেপ না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এমন নির্দেশিকা জারি করে সরকার নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে। ওমর আবদুল্লা ট্যুইট করে বলেছেন, এমন নির্দেশ জারি করা কেন্দ্রীয় সরকারের দেশকে পুলিশ রাষ্ট্রে পরিবর্তিত করার শামিল। তাছাড়া কেউ বলেছেন এই নির্দেশকে 'বিপজ্জনক', কেউ বলেছেন 'চিন্তাজনক'।

অথচ, সন্ত্রাসবাদে রাশ টানতে ইউপিএ সরকারই কম্পিউটারে নজরদারি চালানোর নির্দেশ জারি করেছিল। তখন কিছু নিরাপত্তা সংস্থা নীরবে একাজ করছিল। তাহলে এখন এ নিয়ে এত বিতর্ক কেন? কেন এত জলঘোলা করা, গেল গেল রব তোলা? এ প্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সংসদে বলেছেন, ২০০৯ সাল থেকেই এই নির্দেশিকা জারি রয়েছে। এবার সেই নির্দেশ শুধু পুনর্নবীকরণ হয়েছে। যাঁরা এটাকে তিলকে তাল করে দেখাচ্ছেন তাঁদের জানা উচিত, ইউপিএ জমানাতেই এই নির্দেশ জারি ছিল দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে। সবাইকে জানিয়ে দিতেই এই পদক্ষেপ। অর্থাৎ সক্রিয় করার প্রচেষ্টামাত্র।

সত্যি বলতে কী, বিরোধীদের আজ একটিমাত্র 'অ্যাজেন্ডা'— মোদী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। কারণ মোদী সরকার যেভাবে ভারতকে আর্থিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে চলেছে তাতে বিরোধীরা আতঙ্কিত। আজ ভারতে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তান এবং আমাদের দেশের বেশিরভাগ মাদ্রাসা এবং দেশবিরোধী শক্তি ভীষণ সক্রিয়। আর্থিক দুর্নীতি পর্বতপ্রমাণ। দেশ থেকে টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশে। টাকার বিনিময়ে পাচার হচ্ছে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য। বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের পাণ্ডা (দাউদ, জাকির নায়েক প্রভৃতি)-রা ভারতের এক শ্রেণীর মানুষকে দেশবিরোধী ও জঙ্গি করে তুলছে। পাকিস্তানের ভারত বিরোধী পাণ্ডারাও ওই একই কাজ করছে। তাই ওইসব ভারত বিরোধী কার্যকলাপ রুখতে মোদী সরকার ১০টি স্বশাসিত সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি আদান-প্রদানকারী যন্ত্রে নজরদারি চালানোর। ওইসব সংস্থাতো আর সাধারণ নাগরিকদের কথপোকথনে নজরদারি করছে না বা অভিযোগ তুলছে না। তাহলে এ নিয়ে বিরোধীদের এত আপত্তি বা বিরোধিতা কেন? কেন 'সব শেয়ালের এক রা?' এতে তো দেশদ্রোহীদের সর্বনাশ হওয়ার কথা তবে কী 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়?' হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এর ফলে কিছু দুর্নীতিবাজ, করে-কম্মে খাওয়া রাজনীতিকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। তাই তাঁদের জনগণকে বিভ্রান্ত ও সরকার বিরোধী করে তোলার এই অপপ্রয়াস।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

ডাঃ বিধান রায়ের অন্যদিক

(১) ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট কলকাতায় মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-সম্পর্কে জ্যোতি বসুর ভাষায় 'প্রথম তিন দিনে নিহতদের সংখ্যা ২০ হাজারের কম হবে না'। তাছাড়া নারীধর্ষণ, গৃহদাহের কোনো হিসেব নেই। তার পর ইংরেজ সরকার ওই দাঙ্গার উপর একটা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। সেই রিপোর্টের সমস্ত কপি বিধানবাবু পুড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ।

(২) কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের সন্দেহজনক মৃত্যুর পর শ্যামাপ্রসাদ জননী যোগমায়াদেবী বিধানবাবুকে এক পত্র লিখে সত্য উদ্‌ঘাটনের অনুরোধ জানান। বিধানবাবু অনুসন্ধান না করেই উত্তর দেন শ্যামাপ্রসাদের চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি হয়নি। উদ্দেশ্য ছিল বন্ধু জওহরলালকে বাঁচানো।

(৩) বিধানবাবু ব্যক্তিগত ভাবে খুবই সৎ ছিলেন, কিন্তু কলকাতার এক অসৎ ব্যবসায়ীকে বাঁচানোর জন্য তাকে দিয়ে কিছু টাকা একটা নামকরা হাসপাতালের উন্নয়নে দান করিয়ে তাঁর নামে হাসপাতালের নাম করে তাকে অমর করে রেখেছেন।

(৪) ১৯৫০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু বিতাড়ন আরম্ভ হয়। তিনমাসে ৫০ লক্ষ হিন্দু একবস্ত্রে এপার বাংলায় এসে উপস্থিত হন। ওই সময় আমি ঢাকা শহরের বাসিন্দা ছিলাম। হত্যা নারীধর্ষণ, গৃহদাহ লুটপাটের প্রত্যক্ষদর্শী। ১৮ ফেব্রুয়ারি একবস্ত্রে ঢাকা থেকে ফিরে এসে রোজ আনন্দবাজার অফিসে যেতাম মামার সঙ্গে। তিনি ওই পত্রিকার চিফ সাব এডিটর ছিলেন। ঢাকা থেকে এসেছি শুনে সাংবাদিকরা আমাকে ছেঁকে ধরল। আমি আমার দেখা বিবরণ দিলে তাঁরা সব নোট করে নিলেন। কিন্তু পরের দিন কোনো সংবাদপত্রে ওই সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে সাংবাদিকরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করছেন, পরে মামার নিকট জানতে পারলাম বিধানবাবু আজ অফিসিয়াল ফতোয়া জারি করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু নিধনের কোনো সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য। তার ফলে এখানে দাঙ্গা হলে তার সরকারের বদনাম হবে বলে। উপরোক্ত তথ্যের সত্যতা জানতে যে কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

গৃহকর্ত্রীরা সচেতন হলেই বাড়ির ভেতরের দূষণ কমতে পারে

সুতপা বসাক ভড়

আজকাল বাড়ির বাইরে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে ঘোরাফেরা করতে হয়। নানারকম দুর্ঘটনায় চোট পাওয়া, চুরি-ডাকাতি বা ভিড়ের থেকেও বেশি দূষণঘটিত কারণে অসুস্থ হবার ভয়। আমরা বাড়ির বাইরের দূষণে আক্রান্ত হচ্ছি এবং প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে তার কুফলও ভোগ করছি। গত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাজধানী দিল্লিসহ দেশের সর্বত্র বায়ুদূষণের মাত্রা ভীষণ রকমের বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন অধ্যয়ন ও গবেষণা থেকে জানা যায় যে পরিবেশ দূষণের জন্য

মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকার অসুখে ভুগছে। বাস্তবে 'দূষণ' শব্দটি থেকে আমাদের মনে ভেসে ওঠে যানবাহনের ধোঁয়া, বাড়ি তৈরির সময় বাতাসে ওড়া ধূলিকণা, পাওয়ার প্লান্টের ধুলো ইত্যাদি। এসব থেকে বাঁচার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি। কিন্তু বাড়ির ভেতরের দূষণ সম্বন্ধে বেশি আলোচনা হয় না, যা জ্ঞানে-অজ্ঞানে আমাদের শরীরকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাইরের দূষণ থেকে বাড়ির ভেতরের দূষণ অনেক বেশি সাংঘাতিক।

সম্প্রতি, বাড়ির ভেতরে বায়ুদূষণের ওপর বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। ইন্ডিয়ান পল্যুশন কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দিল্লিতে ১৩টি বহুতল বাড়ির সমীক্ষায় জানা গেছে যে, ওই বাড়িগুলির কার্বন-ডাই-অক্সাইডের স্তর নির্ধারিত সীমা থেকে অনেক বেশি, অর্থাৎ সাংঘাতিক বিপজ্জনক। এর মধ্যে বেশ কিছু করপোরেট অফিসও আছে। এছাড়া অফিসগুলির হাওয়ায় বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুও অধিক সংখ্যায় পাওয়া গেছে। ইন্ডিয়ান স্টেট লেবেল ডিজিস ওয়ার্ডন-এর একটি গবেষণায় জানা গেছে যে, রান্না ও গরম করার জ্বালানি, যেমন— ঘুঁটে, চারকোল, কাঠ ইত্যাদি দেশের ৫০ ভাগ বায়ুদূষণের মুখ্য কারণ। এর ফলে চোখের নানারকম সমস্যা, ফুসফুসের অসুখ, হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি অসুখের বোঝা দেশের অর্থব্যবস্থার ওপর পড়ছে। অনেক সময় রান্নাঘরে পি.এম (পারটিক্যুলেট ম্যাটার) ২.৪ থেকে দশগুণ বেশি হয়ে যায়। ২০১৭ সালে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১.২৪ মিলিয়ন অকাল মৃত্যুর মধ্যে ০.৪৮ মিলিয়ন মৃত্যুর জন্য ঘরের ভেতরের জ্বালানি এবং বাড়ির ভেতরের দূষণ দায়ী। এছাড়া অন্যান্য বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নিমোনিয়া অসুখের জন্য ২৪ শতাংশ ক্ষেত্রে দায়ী বাড়ির ভেতরের দূষণ।

দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, ঘরের ভেতরের দূষণের জন্য অনেক রকমের অসুখে আক্রান্ত হলেও আমরা অনেকেই জানি না যে, বাড়ি-অফিসে ব্যবহার্য অনেক জিনিস এই দূষণের মুখ্য কারণ। বাড়ির ভেতরের মেঝে, বাসন ধোঁয়ার সাবান, পেন্ট, নানারকম মেশিন শৌচাগার, আবর্জনা ইত্যাদি থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস এই দূষণকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের কিছু জিনিস যেমন— পারফিউম, কসমেটিক, মশা মারার বিভিন্ন ব্যবস্থা, এয়ার ফ্রেশনার, বিভিন্ন প্রকার ধূপ এর মধ্যে পড়ে। এছাড়া দেওয়াল, আসবাবপত্রের চটকদার রং, পালিশ, পর্দা, কার্পেট, লেপ-কম্বলের মধ্যে যে কতরকমের ধুলো ও জীবাণু থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। ড্রাইক্লিন করা জামাকাপড়, জল গরম করার জন্য হিটার, ঘরে অফিসের ব্যবহার্য স্টেশনারি, প্রিন্টার, আঠা আরও কতকিছু নীরবে আমাদের অফিস ও বাড়ির ভেতরের আবহাওয়াকে দূষিত করে চলেছে। পোষ্য যেমন, কুকুর-বেড়াল, নানারকম পাখির মল-মূত্র, চুল, ঝরে পড়া শুকনো চামড়া বাড়ির ভেতরের দূষণের স্তর বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নানান রকম অসুখের সৃষ্টি করেছে। বাড়িতে কেউ টিবি বা জ্বরে আক্রান্ত হলেও দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, আধুনিক নকশায় তৈরি বাড়ি এবং অফিসগুলি যথেষ্ট খোলামেলা এবং প্রাকৃতিক আলোতে ভরপুর না হবার জন্য দূষণ স্তর ভীষণ রকমের খারাপ।

বাইরের দূষণ থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ি, অথচ সেখানেও আমরা দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে ফেলেছি। অথচ জীবনের অনেকটা সময় আমরা নিজেদের বাড়ি, অফিস, রেস্টুরেন্টে কাটাই। সেজন্য এই জায়গাগুলিকে দূষণমুক্ত করার দায়িত্ব কেবলমাত্র আমাদের। দিনচর্যার যেসকল জিনিস দূষণের জন্য দায়ী, সেগুলির ব্যবহার কম বা বন্ধ করতে হবে। এজন্য প্রাকৃতিক জিনিসের ব্যবহারের করা একান্ত আবশ্যক। বাইরের দূষণ থেকে বাঁচার জন্য সমাজ, সরকার, সবাই মিলে উদ্যোগ নিতে হবে। পারম্পরিক বাড়িগুলিতে যথেষ্ট জানলা-দরজা থাকে, সেগুলি খুলে রাখলে পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং হাওয়া চলাচল করে। যেসব জিনিস বাড়ির দূষণস্তর বাড়ায়, সেগুলির মধ্যে বেশিরভাগ জিনিসই অত্যাবশ্যক নয়— বিদেশি কোম্পানির আর্থিক লাভ করে দেওয়ার জন্য আমরা সেগুলির লোকদেখানো ব্যবহার করি আর নিজেদের অর্থ এবং স্বাস্থ্য দুটিই নষ্ট করি। এখন আমাদের সচেতন হতে হবে। মহিলারা বাড়িতে অনেকটা সময় কাটান এবং বাড়ির দেখাশুনা করেন। মহিলারা সচেতন হলে অতি সহজেই বাড়ির ভেতরের দূষণ কম হতে পারে। এর ফলে নিজেদের গড় আয়ু আরও সাতমাস বাড়িয়ে নিতে পারা যাবে। ▮

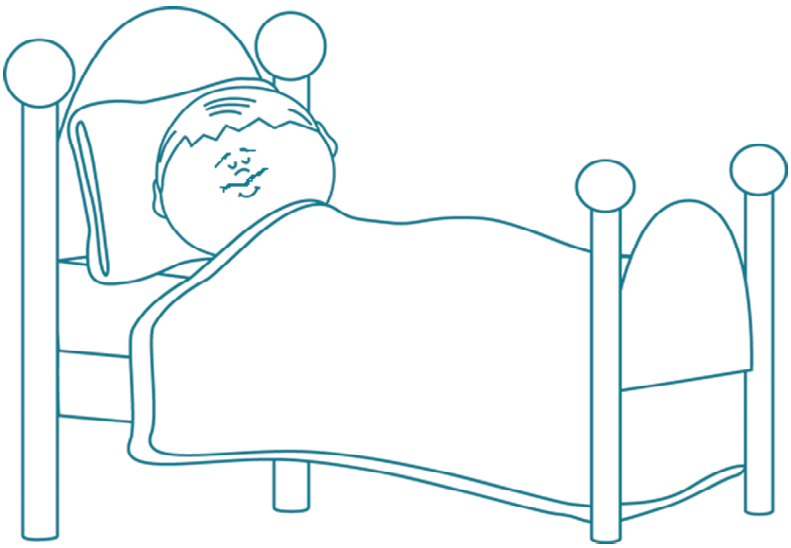

শয়ন ও নিদ্রা শান্তচিত্তে হওয়া উচিত

অতিসবরণ আইচ

- শয়নের ভঙ্গিমার উপর অনেকটা নির্ভর করে আমাদের নিদ্রা ও স্বাস্থ্য।
- পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়ে শয়ন করতে হয়।
- পা-দুটো টান করে রাত্রে বামদিকে ও দিনে ডানদিকে কাত হয়ে শুতে হয়।
- পাশবালিশে পা তুলে ঘুমানো অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।
- রাত্রে ডান নাকে ও দিনে বাম নাকে শ্বাস চলাকালীন ঘুমোতে হয়।
- তুলোর বালিশে ও তুলোর তোশকেই ঘুমানো স্বাস্থ্যকর।
- সিন্থেটিক বালিশ ও তোশক ব্যবহার বর্জন করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর।
- জাজিম ব্যবহার না করে শুধু পাতলা তোশক বা তুলোর কম্বলের ওপর শয়নই স্বাস্থ্যকর।
- খাটিয়া বা ঝুলন্ত ক্যাম্প খাটে শোওয়া স্বাস্থ্যকর নয়।
- উলঙ্গ হয়ে শয়ন নিষিদ্ধ। সুতি ও পশমি পোশাক ছাড়া অন্য পোশাক অস্বাস্থ্যকর।
- মশা থাক না-থাক মশারির মধ্যেই শয়ন করা উচিত।
- কোনোরকম ধোঁয়া বা গ্যাস শয়নকক্ষে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।
- বালিশ ছাড়া বা হাতের উপর মাথা রেখে শয়ন করা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।
- পায়ে মোজা ও মাথায় টুপি পরে শোওয়া ভালো নয়।
- 'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা...' সব জীব নিদ্রাধীন। প্রকৃতির এক অনন্য অবদান এই নিদ্রা।
- নিদ্রার জন্য সাধনা প্রার্থনা কিছুই করতে হয় না। নিদ্রার আগমন-গমন স্বাভাবিকভাবেই হয়।

- নিদ্রাল্পতা ও অধিক নিদ্রা ব্যাধির লক্ষণ।
- সারাদিনে ৬ ঘণ্টার কম ও ৮ ঘণ্টার বেশি নিদ্রা অস্বাভাবিক।
- নিদ্রার স্বাভাবিক সময় রাত্রিকাল। রাত্রিকালে যাঁরা জীবিকার বা অন্য কারণে ঘুমোতে পারেন না, তাঁরা দিনের বেলায় যেকোনো সময়ে ঘুমোতে পারেন।
- মনের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা, অভিমান-অহংকার বেশি মাত্রায় থাকলে ঘুমের বিঘ্ন হয়।
- নিদ্রা সাধারণত দু'প্রকার। স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি।
- সুষুপ্তি অধিক ভালো হলেও স্বপ্ন মন্দ নয়। স্বপ্ন দেখলে সৃজনী শক্তির প্রকাশ পায়।
- নিদ্রার পূর্বে মন শান্ত করলে ভালো ঘুম হয়।
- রাত্রে কম ঘুম হলে দিনে সেটা পূরণ করে নিতে হবে।
- জাগ্রত অবস্থার সব তুচ্ছতার-উচ্চতার অবসান ঘটে নিদ্রাকালে। নিদ্রামগ্ন চৌকিদার ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। মৃত্যুপথযাত্রী রুগি আর সদ্য অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দৌড়বীরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।
- নিদ্রা মানুষের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। নিদ্রা শুধু ক্লান্তি দুর করে না, মনের অনেক জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেয়।
- একটু ঘুম অনেক দুঃখ-কষ্ট-বিরহ থেকে মানুষকে মুক্ত দেয়; যা বিশ্বের কোনো ওষুধ পারে না।
- নিরুপদ্রব নিষ্কণ্টক নিদ্রা দেবদুর্লভ। সেই নিদ্রা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জয়তু জয়তু নিদ্রাদেবী। (সাবধান, কুম্ভকর্ণ যেন কাউকে গ্রাস না করে)।
- নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে এমন কিছু করলে হবে না। টিভি, মোবাইল, ল্যাপটপ ঘুমের অনেক আগে ত্যাগ করতে হবে।
- খাওয়া ও শোয়ার মাঝে কমপক্ষে এক ঘণ্টা ব্যবধান থাকা উচিত।
- রাত্রে নিদ্রার আগে মিনিট দশেক ধীর পায়ে হাঁটলে ভালো।
- প্রিয় ঠাকুর দেবতার নাম জপ করতে করতে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার অভ্যাসটা খুব ভালো।
- ভ্রামরী প্রাণায়াম নিদ্রার আগে করলে ভালো ঘুম হয়। গরম দুধ বা জল চুমুক দিয়ে খেলে ভালো ঘুম হয়।
- সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরেই ঘুমোতে হয়। ডিমলাইটও জ্বলবে না।

জাতীয় স্বার্থে নয়, মমতার ব্রিগেড সমাবেশ নিজের স্বার্থেই

সনাতন রায়

পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিকরা অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন, একদা প্রবীণ কংগ্রেস রাজনীতিবিদ সুব্রত মুখোপাধ্যায় তখনকার কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বেদের মেয়ে জোছনা' বলে ঠাট্টা করেছিলেন। বেদের মেয়ে জোছনা ছিল মূলত বাংলাদেশের সিনেমা। তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত এবং ইলিয়াস কাঞ্চন ও অঞ্জু ঘোষ অভিনীত এই সিনেমাটি বাংলা সিনেমার জগতে ছিল একটা মাইলস্টোন। কারণ ১৯৮৯ সালে সিনেমাটি রিলিজ হওয়ার পর আগের সমস্ত বাংলা সিনেমার জনপ্রিয়তার রেকর্ড ভেঙে খানখান করে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিনের সুব্রত মুখোপাধ্যায়, আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, কেন এই ঠাট্টা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন মমতার দিকে? বেদের মেয়ে জোছনা সিনেমার সবচেয়ে জনপ্রিয় গানটি ছিল— 'বেদের মেয়ে জোছনা আমায় কথা দিয়েছে। আসি আসি বলে জোছনা ফাঁকি দিয়েছে।' বলেছিলেন, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনকার মতো তখনও কথা দিয়ে কথা রাখতেন না।

এখানেই শেষ নয়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া আরও একটি বক্তব্য খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ''মমতা কেন এত মিথ্যে কথা বলে আর নতুন শাড়ি ছিঁড়ে ফের তা সেলাই করে পরে, আমি বুঝতে পারি না।''

সুব্রত মুখোপাধ্যায় শুধু কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজও মানুষ চিনতে ভুল করেন। ভুল করেন শুধু বাঙ্গালিরাই? না, গোটা ভারতবর্ষের তাবড় রাজনীতিবিদরাও। তার প্রমাণ গত ১৯ জানুয়ারির কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় বিরোধী শিবিরের তাবড় নেতাদের উপস্থিতি। এক কংগ্রেস ছাড়া। অতীতে কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী মমতাকে চিনতে ভুল করলেও বর্তমান সভাপতি রাহুল গান্ধী ভুল করেননি। বাকিরা সকলেই পাহাড়প্রমাণ ভুলের মাশুল দেবেন অচিরেই।

কেন? সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটু দেখে নেওয়া যাক, মমতা নামক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বটি কেমন?

সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর ইমেজ হলো, 'মমতা বাঙ্গালির ঘরের মেয়ে।' আটপৌরে শাড়ি পরার জন্যই নয়, মমতার জীবনযাত্রাটাই 'আটপৌরে।' থাকেন টালি নালার পাশে টালির চালের বাড়িতে। সুটগি, জোমাটো, কে এফ সি-র জিভে জল আনা খাবার নয়— তাঁর প্রথম পছন্দ মুড়ি আর চপ। বিদেশি তো নয়ই, এমনকী বাটা বা নিদেনপক্ষে শ্রীলেদার্সের জুতোও নয়, তাঁর পায়ে সর্বদাই হাওয়াই চপ্পল।

তা সে জেনেভার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মঞ্চেই হোক কিংবা লন্ডনের টেমস নদীর পাড় বরাবর মন উদাস করে দেওয়া রাস্তাই হোক, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েও বড়ো গাড়ি চাপেন না। রাজভবনে থাকেন না। অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ভুল ইংরেজি, হাস্যকর হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা দেন। ততোধিক হাস্যকর তাঁর ইতিহাস জ্ঞান— যেমন সাঁওতালি ভাষায় ডহরের অর্থ

বাগিচা হলেও তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহের আরও দুই নায়ক সিধো, কানহ-র মতো ডহরবাবুকেও সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক হিসেবেই চেনেন এবং জানেন, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় অনশনরত মহাত্মা গান্ধীকে লেবুর রস খাইয়ে অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন নাকি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদিও তার পাঁচ বছর আগেই ১৯৪১ সালে কবিগুরু দেহত্যাগ করেছিলেন। মমতা আটপৌরে— তাই তিনি অনায়াসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন তীব্র বিরোধী নেতা জ্যোতি বসুকেও। মমতা আটপৌরে— তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েও কলকাতা পুলিশের 'জয় হো' অনুষ্ঠানের দর্শকাসনে, স্টার জলসা, জি টিভি-র নাচন কোঁদনের দর্শকাসনে অনায়াসে বসে থাকেন সাড়ে তিন ঘণ্টা। মমতা আটপৌরে বলেই তাঁর জাল পি এইচ ডি-র শংসাপত্র দেখেও বাঙ্গালি হেসেছে। বেদের মেয়ে জোছনা নামে নামাঙ্কিত হলেও তিনি নিজে রাগ করেননি।

কিন্তু এই আটপৌরে মমতা এখন কেমন? যদি বলা হয়, তিনি বদলে গেছেন। যদি বলা হয় তিনি এখন যে তাঁতের শাড়ি বা হাওয়াই চপ্পল পরেন তা নামিদামি ব্র্যান্ডের শাড়ি বা চপ্পলের চেয়ে অনেক দামি। যদি বলা হয়, তিনি এখন এক জেলা থেকে আর এক জেলায় যেতে গেলেও ডেকে নেন হেলিকপ্টার। যদি বলা হয়, তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ের রিসেপশন হয় দিল্লির পাঁচতারা হোটেলে। যদি বলা হয়, তার বড়দা এবং ছোটো দুই ভাই এখন কলকাতার সেরা ধনীদের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত নাগরিক। যদি বলা হয় তাঁর বড়দার হোটেল ব্যবসার হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত দেখেও তিনি চোখ বুজে থাকেন, ভাইপো রায়চকে সাততারা রিসর্ট বানাচ্ছেন শুনেও মুখে রা কাটেন না! যদি বলা হয়, তার প্রিয় একদা গরিব সাংবাদিকদের কেউ কেউ যাঁরা তাঁর পায়ে পায়ে লুটিয়ে বেড়ায় তারা সব হঠাৎ করেই কোটি কোটিপতি কোন ম্যাজিক দণ্ডের ছোঁয়ায়, অথচ তিনি তাঁদের নিয়েই পাঁচতারা হোটেলে বসে গানের তালিম দেন তাহলে ভুল বলা হবে। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষটির আটপৌরে জীবনটি হলো তাঁর ছায়া। কায়াটি আজ যা দেখছেন, তেমনই। বরাবরই। মানুষ তাঁকে চিনতে পারেনি। যেমন চিনতে পারেননি ভালোমানুষ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া থেকে শুরু করে বিজেপির বোঝা, বলিউডের সুপার স্টার শত্রুঘ্ন সিনহা পর্যন্ত সকলেই, যাঁরা ব্রিগেডের মঞ্চ আলোকিত করে বসেছিলেন গত ১৯ জানুয়ারি।

ব্রিগেড সমাবেশ কেন? মমতার প্রচার ছিল : (১) গণতন্ত্র বাঁচাও, স্বৈরতন্ত্র হঠাও। (২) মোদী হঠাও দেশ বাঁচাও, (৩) সমস্ত বিরোধী দল এক হও। কে বলছেন একথা? সেই মমতা যিনি রাজ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও গণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে হত্যা করেছেন। এখনও করে চলেছেন। বিরোধীদের ডাকা ধর্মঘটে বাধা দিয়ে, বিরোধীদের সভা-সমাবেশ করার অনুমতি না দিয়ে, এমনকী বিরোধী নেতাদের প্রয়োজনে হেলিপ্যাড ব্যবহারের অনুমতি না দিয়ে। একথা বলছেন সেই মমতা যিনি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গণমাধ্যমকে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন আর বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের বাড়ি থেকে তুলে এনে সকলের অজান্তে কোমরে রিভলবার ঠেকিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখাতে বাধ্য করছেন।

মোদী হঠাও, দেশ বাঁচাও কেন? কারণ মোদীর হাতেই ধরা পড়েছেন তিনি এবং তাঁর দলের নেতা-নেত্রীরা শ'য়ে শ'য়ে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে, নারদা কেলেঙ্কারিতে। মমতা বুঝে গেছেন, এখন সিবিআই আর ই ডি-র হাত থেকে বাঁচতে গেলে মোদীকে তেল দিয়ে লাভ হবে না। কারণ মোদী তৈলভক্ত নন। অতএব বাঁচতে গেলে দল পাকাও। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই-বোন হয়ে যাতে কিছুদিন বাঁচা যায় জেলবন্দি হওয়ার হাত থেকে।

ব্রিগেডে নেতারা বুঝতেই পারেননি— মমতার গোটা গেমপ্ল্যানটি বিরোধীদের স্বার্থে নয়। তাঁর নিজের স্বার্থে। কীরকম?

(১) প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের আগামী ভোটে নিজের আসন এবং দলটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা। দেশ নিয়ে, মোদী নিয়ে তাঁর যে হইচই সবটার পিছনেই রয়েছে এক গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। তা হলো মানুষের দৃষ্টিকে জাতীয় রাজনীতির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, যাতে মানুষ রাজ্যের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে না পারেন। মোদী-বিরোধী স্লোগানের ঝাপটায় তিনি মুছে দিতে চাইছেন রাজ্যের মানুষের ভিতর জন্ম নেওয়া রাজ্য সরকার বিরোধী, তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী, সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনমতকে।

(২) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, ভারতবর্ষের মোদী-বিরোধী আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সমঝোতার সূত্র জোরদার করা যাতে মোদী বিরোধী অন্যতম রাজনৈতিক দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং অন্য রাজ্যে ২/৪টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে জাতীয় দলের মর্যাদাভুক্ত করা যায়।

৩। রাজ্যে তাঁর 'প্রবল প্রতাপ' চাক্ষুষ করিয়ে অন্য নেতাদের তাঁর নেত্রী হয়ে ওঠা

দেখানো যাতে সুযোগ হলে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নামটিই অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪। পশ্চিমবঙ্গে এককভাবে লোকসভা নির্বাচনে তিনি যে ফলাফল করবেন, তার ধারে কাছেও থাকবে না অন্য রাজ্যের কোনও আঞ্চলিক দল। অতএব মোদী-বিরোধিতার শ্রেষ্ঠ স্থানটি থাকবে তাঁরই দখলে এবং সেই চাপ রেখে তিনি প্রয়োজনে বিজেপিকে বাধ্য করবেন তৃণমূলের সমর্থন নিতে এবং তা তাঁর শর্তে। শর্তটি হলো--- মোদী নন, প্রধানমন্ত্রী হোন অন্য কেউ— নীতীন গড়কড়ি, সুষমা স্বরাজ বা আর কেউ।

৫। আর সেই ফাঁকে তিনি বিজেপির ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন, তাঁর দল, দলীয় নেতা-নেত্রী ও প্রিয় সাংবাদিকদের ওপর থেকে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি বা সারদা-নারদার দুর্নীতির অভিযোগের ঘেরাটোপ তুলে নিতে এবং নিশ্চিন্তে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর স্বৈরাচারী শাসন কায়েম রাখতে।

৬। মমতা বোঝেন, বিজেপির অবস্থা এত খারাপ নয় যে '২০১৯ বিজেপি ফিনিশ' স্লোগান তুললেই বিজেপি ফুসমন্তরে উবে যাবে। মমতা এও বোঝেন, কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে যেভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তাতে কংগ্রেসকেও দুর-ছাই বলে ঝেড়ে ফেলা যাবে না। কিন্তু রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব যে তাঁর না-পসন্দ। অতএব আপাতত 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ভাবটা রাখতে হবে। তাতে এ রাজ্যেও কংগ্রেসের শক্তিকে পদানত রাখা যাবে।

৭। একই সঙ্গে সিপিএম নামক রাজনৈতিক শক্তিটিকেও দূরে ঠেলে ফেলা সম্ভব হবে। কারণ তিনি যখনই দেখবেন বিজেপির সমকক্ষ শক্তি হয়ে উঠছে কংগ্রেস, তিনি সমর্থন জানাতে দ্বিধা করবেন না। আর তাতে সিপিএম আর কংগ্রেসের 'বন্ধু' হয়ে উঠতে পারবে না। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার--- মমতার ব্রিগেড সমাবেশের ছক তৈরি হয়েছে রীতিমতো আঁটোসাঁটো রাজনীতির অঙ্ক কষে। বিরোধীরা ভাবছেন, মমতা তাঁদের হাতে হাত মিলিয়েছেন মানে একটা বৃহৎ শক্তিকে সঙ্গে পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁরা এই অঙ্কটা এখনও কষতে পারছেন না যে, 'কাছের বন্ধু' হিসেবে মমতার প্রথম পছন্দ বিজেপি আর দ্বিতীয় পছন্দ কংগ্রেস। তিনি ভালো করেই বোঝেন বাকিরা সব চুনোপুঁটি। কেউই তাঁর সাধ মেটাতে সমর্থ নয়। অবশ্য কেউ কেউ মমতার এই ছকটি বোঝেননি তা নয়। মঞ্চে দাঁড়িয়েই কিছুটা আঁচ দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং জে ডি (এস)-র নেতা এইচ ডি দেবেগৌড়া আর জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। আর তা ভালভাবে বুঝে গিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুললেন পরদিন। লালুপ্রসাদ যাদবপুত্র তেজস্বী যাদব আর ডি এম কে নেতা স্ট্যালিন তাঁরা মমতাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন— ধরতে হলে রাঘব বোয়ালই ভালো। মমতার মতো রাজ্যভিত্তিক চুনোপুঁটি ধরে হাতগন্ধ করে লাভ নেই। ঠিক সেই কারণেই তেলেঙ্গানার টি আর এস নেতা কে চন্দ্রশেখর রাও, তেলুগু দেশম নেতা চন্দ্রশেখর নাইডুও পা বাড়িয়ে কংগ্রেসের দিকেই।

আটপৌরে মমতা যে আসলে ধান্দাবাজ মমতা--- সেটা বুঝেছেন রাজ্যের মানুষও। তাই এবারের ব্রিগেড মমতার আগের ব্রিগেড হয়ে উঠতে পারেনি। প্রচার যে স্তরে করা হয়েছে, যেভাবে নদীর স্রোতের মতো অর্থব্যয় করা হয়েছে, যেভাবে সর্বস্তরের কর্মীরা পরিশ্রম করেছেন, সে তুলনায় জনগণের সাড়া মেলেনি। একেই ময়দানের অর্ধাংশ জুড়ে পাঁচ পাঁচটা ঢাউস মঞ্চ। তার সামনে বিশাল নিরাপত্তা বলয়। তারপরেও ব্রিগেডের বাকি অংশটুকু দুপুর দুটোর সময়ও ভরে ওঠেনি। যার ফলে মমতাকে বার বার ঘোষণা করতে হয়েছে— বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। বলতে হয়েছে, চারটের আগে কেউ মাঠ ছাড়বেন না। মনে রাখবেন, আমিই সবার শেষে বলব। তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। মমতার ভাষণও সেভাবে ধারালো হয়ে উঠতে পারেনি। বক্তারাও বেশিরভাগ ছিলেন বি-গ্রেড রাজনীতিবিদ। এবারের ব্রিগেড সমাবেশ তাই পরিণত হয়েছে বি-গ্রেড সমাবেশে। কারণ আটপৌরে মমতার বদলের সঙ্গে সঙ্গে জনতার মনও বদলাচ্ছে দ্রুত। মমতা ম্যাজিকের জাদুদণ্ডের ধার পড়ে গেছে। মানুষের সামনে সততার প্রতীক মমতা আজ মিথ্যেবাদী। দুর্নীতির বোঝায় ন্যুব্জ, স্বৈরতন্ত্রী প্রশাসক, পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ। তিনি আজ মানুষের বন্ধু নন, গণশত্রু। দেশের সংবিধানকে অসম্মান করেন এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী। সর্বোপরি এক নির্লজ্জ মহিলা নেত্রী। প্রতিশ্রুতি খেলাপী 'বেদের মেয়ে জোছনা'। ■

সুব্রত উবাচ

(সূত্র : এবেলা ডট ইন ৮ এপ্রিল ২০১৬)

নারদ ক্যামেরার সামনে ম্যাথু ওরফে সন্তোষ শঙ্করণকে সাক্ষাৎকারে সুব্রত মুখোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যা বলেছিলেন— "আমার নেত্রী মমতার বাংলায় প্রচুর জনসমর্থন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, আমার নেত্রী বা আমার দলের জাতীয় স্তরে কোনও সমর্থন নেই। আমি দিল্লির কথা বলছি। নোবডি উইল বিলিভ হার। দ্যাট ইজ বিগ মাইনাস পয়েন্ট' (কেউ ওকে (মমতাকে)) বিশ্বাস করবে না। এটাই সবচেয়ে বড় নেতিবাচক দিক)। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী যদি ২০০ প্লাস সিট পান তাহলে তাকে (মমতা) শুধু কাঁদতে হবে। কেউ তার স্বপ্নপূরণে আসবে না। এরপর মমতা সরাসরি বা গোপনে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও ভাবেই মোদী বা বিজেপিকে ছুঁতে পারবে না। ওর দল টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। যদি টাকা বা অন্য কিছুর জন্য ও (মমতা) বিজেপিকে সমর্থন করে তাহলে আমরা ফিরে যাব (কেন্দ্রে)।"

ম্যাথুর হাত থেকে টাকা নেবার সময় মন্তব্য করলেন--- "কলকাতায় অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মমতাকে সাহায্য করেছিল নন্দীগ্রামের সময়।"

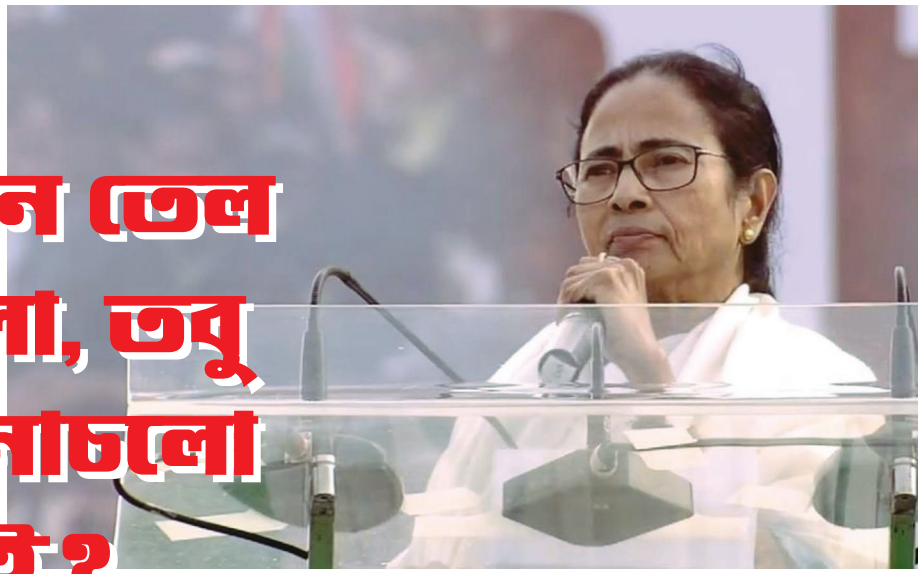

সাতমন তেল পুড়লো, তবু রাধা নাচলো কই?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

গত উনিশে জানুয়ারি ব্রিগেড ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে অনুষ্ঠিত জনসভায় দেশের বিরোধী দলগুলির সমবেতভাবে অংশগ্রহণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসাহিত করেছে। ব্রিগেডের এই সমাবেশে মমতা তাঁর প্রস্তাবিত ফেডারেল ফ্রন্টের একটি চেহারা অন্তত জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পেরেছেন। বিরোধী নেতাদের উপস্থিতির নিরিখে, বলাই যায়, ব্রিগেডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই সভাটি সফল। এখন বেশ কিছুদিন তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী এই সভার সুখস্মৃতি রোমন্থন করতে থাকবেন এবং আপাতত কিছুদিন সুখস্বপ্নে বিভোরও থাকবেন। ব্রিগেডের এই সভাকে কেন্দ্র করে মমতার আত্মতৃপ্তি ভোগ করার কিছু কারণও আছে। প্রথমত, সেই আশির দশকে জ্যোতি বসু ব্যতীত সাম্প্রতিক অতীতে সমস্ত বিরোধী নেতাকে এক মঞ্চে হাজির করাতে তিনি ছাড়া আর কেউ পারেননি। এটা তাঁকে অন্যান্য বিরোধী নেতাদের থেকে কয়েক কদম এগিয়ে রাখবে। যার ফলে জাতীয় রাজনীতিতে তিনি আপাতত কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবেন। দ্বিতীয়ত, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ব্রিগেড সমাবেশের আয়োজন করে রাজ্য-রাজনীতিতেও তিনি নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবেন। তৃতীয়ত, বারংবার কংগ্রেস এবং বিজেপির থেকে সমদূরত্বের যে ফেডারেল ফ্রন্টের কথা তিনি বলে এসেছেন, জাতীয় রাজনীতিতে তার গ্রহণযোগ্যতাও কিছুটা হলেও অন্তত অনুভূত হবে। কাজেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দিক দিয়ে বিচার করলে, উনিশে জানুয়ারির ওই ব্রিগেড সমাবেশ রাজনৈতিক দিক থেকে কিছুটা সুফলই এনে দিয়েছে।

কিন্তু এ হলো ব্রিগেড সমাবেশের একটি দিক। এদিকটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আলোকিত করে। যা চকচক করে তা-ই যেমন সোনা নয়, তেমনই প্রায় একশো কোটি টাকা খরচ করে আয়োজিত এই ব্রিগেড সমাবেশটিও কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সতীর্থ বিরোধী নেতাদের সামনে এখনই দিল্লি দখলের সুবর্ণ সুযোগ এনে দিচ্ছে না। বরং এই ব্রিগেড সমাবেশটিকে যথার্থভাবে বিচার করলে এটুকুই মনে হবে, এই সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎফুল্ল হওয়ার প্রকৃতই কোনো কারণ নেই। বিপরীতে, যথেষ্ট চিন্তিত হওয়ারই কারণ রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী নেতারা এই ব্রিগেড সমাবেশে এক ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শক্তিকেই তুলে ধরা গেল বলে মনে করছেন। কিন্তু সত্যই কি বিরোধীদের চেহারাটি ঐক্যবদ্ধ? উনিশে জানুয়ারি, যেদিন ব্রিগেড ময়দানে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেদিনই কলকাতার একটি বহুল প্রচরিত সংবাদপত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। একটি সংবাদের শিরোনাম 'কার আসন কাকে, ধন্দে বুয়া-বাবুয়া।' ওই প্রকাশিত সংবাদের একটি অংশে লেখা হয়েছে, 'তবে বাইরের দলগুলিকে এত বাড়তি আসন কার কোটা থেকে দেওয়া হবে, গোল বেঁধেছে তা নিয়েই। সূত্রের খবর, মায়াবতী নিজের ভাগের একটি আসনও ছাড়তে রাজি নন। কারণ ৩৮টি আসনে লড়ার শর্তেই তিনি জোটে রাজি হয়েছেন, উত্তরপ্রদেশে বিরোধী জোটকে সফল করার চেয়েও তাঁর লক্ষ্য যতগুলি সম্ভব বেশি আসন ধরে রাখা।' উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে সমাজবাদী-পার্টি বহুজন সমাজবাদী পার্টি জোট গড়েনি। ফলে বিজেপির বিনা প্রয়াসেই সেখানে বিরোধী ভোট ভাগ হবে। তার ওপর জোটকে সফল করার থেকেও নিজের আসন বৃদ্ধিই যদি মায়াবতীর লক্ষ্য হয়, তাহলে বোঝাই যায় কার্যক্ষেত্রে সপা-বসপার জোটটি হাসির খোরাক হয়ে থাকবেই। তদুপরি, মমতার আহ্বানে ব্রিগেড সমাবেশে

মায়াবতী নিজে আসেননি। পাঠিয়েছিলেন তাঁর এক প্রতিনিধিকে। ওই প্রতিনিধি আসা না আসা দুই-ই সমান। কেননা তাঁর পার্টিতে মায়াবতীই শেষ কথা। দ্বিতীয় আর একটি সংবাদের শিরোনাম 'জোট ভেস্তে গেল আপ-কংগ্রেসের।' ওই সংবাদে লেখা হয়েছে, ''আপ নেতা তার দলের রাজনৈতিক কমিটির প্রধান গোপাল রাই সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'দেশের স্বার্থে বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেসের বিষ পান করতে দল রাজি ছিল। কিন্তু স্পষ্ট কংগ্রেস নিজের ঔদ্ধত্য নিয়েই আছে। তাই দিল্লি, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় একা লড়ব আমরা।'' পরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শীলা দীক্ষিতও বলেন, আমরাও আগেই বলেছি জোট হচ্ছে না।'' এই দুটি সংবাদেই প্রকাশ, বহুলচর্চিত এই বিরোধী জোটের প্রকৃত অবস্থাটি কী। পরস্পরের প্রতি আস্থাহীন, নিজ নিজ স্বার্থতুষ্টিতে ব্যস্ত এই নেতারা যে কখনই একে অপরের হাত ধরতে পারবেন না— তা পরিষ্কার। বরং, নির্বাচনের দিনক্ষণ আরও যতই ঘনিয়ে আসবে, আসন বণ্টনের বিষয়টি যখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, অনুমান করাই যায়, এদের পারস্পরিক কলহও তখন আরও নগ্ন হবে। বুয়া-বাবুয়ার এখন যতই প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক হোক না কেন, বুয়া যে তখন বাবুয়ার সঙ্গ ত্যাগ করবেন না, এমন গ্যারান্টি কিন্তু নেই। যে নেতাদের এইরকম রাজনৈতিক চরিত্র, তাদের পক্ষে বিজেপির মতো একটি সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে কোনও রকম শক্তপোক্ত জোট গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, এই ব্রিগেড ময়দানের সমাবেশে সমবেত হওয়া এই বিরোধী নেতা-নেত্রীরা তাদের কোনও বিকল্প কর্মসূচী ঘোষণা করতে পারেননি। এই সমাবেশে নেতা-নেত্রীদের মুখে একটিই আওয়াজ উঠল— মোদী হঠাও। কোন নেতা-নেত্রীরা এই মোদী হঠাওয়ের

ঠগস অব হিন্দুস্থান

অরবিন্দ কেজরিওয়াল

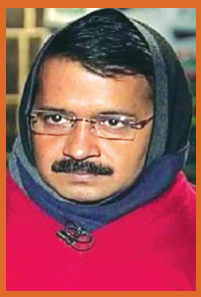

সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ৮০ জনকে খাওয়ানোর জন্য ১০ লক্ষ টাকা খরচ করেন। প্রত্যেক প্লেটের দাম পড়েছিল ১২ হাজার টাকা করে। ২০১৭ সালে কেজরিওয়াল সরকার পেঁয়াজ কেনে ১৮ টাকা/কেজি দরে কিন্তু পরে সরকারি তত্ত্বাবধানে সেই পেঁয়াজ বিক্রি করা হয় ৩০ টাকা/কেজি দরে। ওই বছরেই দিল্লি সরকার ১৫ টন চিনি ৩৩.৯০ টাকা/কেজি দরে সৈনিক ফুড প্রাইভেট লিমিটেডের কাছ থেকে এবং ৮৬ টন চিঠি ৩০.৮৭ টাকা/কেজি দরে ডক্টর ফ্রোজেন ফুড ইন্ডিয়া লিমিটেডের কাছ থেকে কেনে। কিন্তু সেই সময় সারা ভারতে চিনির দাম ছিল ২৫ টাকা/কেজি। উচ্চ নিরাপত্তা সম্পন্ন নাম্বার প্লেটের দাম দিল্লিতে ১১৯ টাকা। অথচ কেজরিওয়াল ক্ষমতায় আসার আড়াই বছরের মধ্যেই তার দাম হয়ে গিয়েছিল ১২০০ টাকা। দিল্লিতে প্রতি মাসে ৩০ লক্ষ গাড়ি নথিভুক্ত করা হয়। সেই হিসেবে এটি ৩০০ কোটি টাকার দুর্নীতি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সত্যেন্দ্র জৈনের কাছ থেকে ২ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন। অভিযোগের উত্তরে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলেছিলেন, 'রাজনীতিতে এসব হয়। এই নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

এন. চন্দ্রবাবু নাইডু

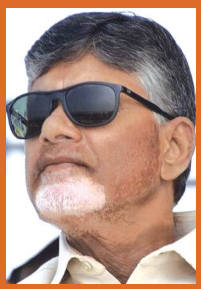

এন. চন্দ্রবাবু নাইডুর আর্থিক কেলেঙ্কারির পরিমাণ ৩.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা। দাবি করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিরোধীনেতা এবং ওয়াই এস আর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ওয়াই.এস. জগন্মোহন রেড্ডি। তাঁর অভিযোগ, অমরাবতী এবং বিশাখাপত্তনমে নির্মীয়মাণ উপকূলবর্তী শহরের প্রতিটিতে ১ লক্ষ কোটি টাকা করে দুর্নীতি হয়েছে। ভালো ভালো জমি জলের দরে পকেটস্থ করেছে তেলেগু দেশমের নেতারা। গত তিন বছরে চন্দ্রবাবু নাইডুর সরকার মোট ৫৬টি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে সব থেকে বিতর্কিত নাতির প্রতি চন্দ্রবাবুর দরদ। নাতিকে ৩০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি দিয়েছেন চন্দ্রবাবু।

মায়াবতী

মায়াবতী ক্ষমতায় থাকার সময় ৫,৭০০ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে। সিএজি রিপোর্ট অনুযায়ী নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যত টাকা খরচ করেছেন তার মধ্যে ৬৬ কোটি টাকার হিসেব দিতে পারেননি। সরকারি পেনশন প্রকল্পে ৪ লক্ষ ভুয়ো নাম পাওয়া গেছে। যাদের দেওয়া পেনসনের পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকা। বিনা টেন্ডারে সরকার পরিচালিত ২৪টি সুগার মিল ২৫ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এইসব লেনদেনের অধিকাংশই সরকারি নথিপত্রে নেই। এক মদ ব্যবসায়ীকে বোতল পিছু ২৫ টাকা দাম বাড়াবার অনুমতি দিয়ে ১০ হাজার কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ। নয়ডা এবং গ্রেটার নয়ডায় জমি হস্তান্তর নিয়েও ৪০ হাজার কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ।

আওয়াজ তুললেন? তাঁদের রাজনৈতিক অতীতটি কী? মোদী হঠানোর ডাক দেওয়া অখিলেশ যাদব উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর আসন হারার পরে ৮০০ কোটি টাকা খরচ করে একটি সাততারা হোটেল বানিয়েছেন। ১৩০০ কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে দোষী প্রমাণিত হয়ে জেলে থাকা লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বীপ্রতাপ মোদী হঠানোর ডাক দিয়েছেন। ৬ মাসের নাতির নামে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির মালিকানা দেখানো চন্দ্রবাবু নাইডু ব্রিগেডে দাঁড়িয়ে মোদীকে হঠানোর কথা বলেছেন। সীমাহীন দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, নিজের পরিবারের নামে কয়েক হাজার কোটি টাকা সম্পত্তি বানানো নেত্রী মায়াবতীর দলের প্রতিনিধি মোদী হঠানোর ডাক দিয়েছেন। যার পরিবারের সদস্য এবং দলের নেতাদের বিরুদ্ধে টু-জি-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, সেই ডি এম কে নেতা স্ট্যালিন ব্রিগেডের ময়দানে গর্জন করেছেন। যার মন্ত্রীসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, সেই আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন মোদী হঠাতে হবে। সারা দেশে জাতপাতের দাঙ্গা ছড়িয়ে দেওয়ার দুই চক্রান্তকারী জিগনেশ মেওয়ানি এবং হার্দিক প্যাটেল মোদী হঠানোর দলে রয়েছেন। সর্বোপরি রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর দল সারদা, নারদা, রোজভ্যালি কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত। এই নেতা-নেত্রীদের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই বিজেপির বক্তব্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। বিজেপি বারে বারেই বলেছে, নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতেই এই নেতা-নেত্রীরা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে জোট গড়ার ডাক দিচ্ছেন। তদুপরি, আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই নেতা-নেত্রীরা সরকার বদলের ডাক দিলে তা মানুষের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, তা নিয়েও সংশয় থেকে যায়। ফলে, মানুষের কাছে এই জোট নীতি-কর্মসূচি হীন একটি স্বার্থসর্বস্ব জোট ব্যতীত অন্য কোনো রূপেই প্রতিভাত হবে না।

তৃতীয়ত, উনিশে জানুয়ারি ব্রিগেড জুড়ে 'মোদী-মোদী' রব তুলে এই বিরোধী নেতা-নেত্রীরা নিজেরাই প্রমাণই করে দিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদী নামক ওই ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে একক ভাবে লড়াই করার ক্ষমতা তাদের কারোরই নেই। অর্থাৎ তারা কেউই নরেন্দ্র মোদীর সমকক্ষ নন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে এটিই বিজেপির সব থেকে বড়ো সাফল্য। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অন্তত এটি বলতে পারবে, প্রধানমন্ত্রী করার মতো কোনো যোগ্য ব্যক্তিই বিরোধী শিবিরে নেই। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে কাউকে তুলে ধরতে না পারার ব্যর্থতা বিরোধী শিবির সম্পর্কে মানুষকে সন্দিগ্ধ করে তুলবে। যতই বিরোধীরা বলুন না কেন, নির্বাচনের পরেই আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্থির করব— সে বক্তব্যে ভোটদাতাদের চিঁড়ে খুব একটা ভিজবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ, ভোটদাতারা জানতে চাইবেই মোদীর বদলে কে? আর এই মোক্ষম প্রশ্নটিরই কোনো জবাব নেই বিরোধীদের কাছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোনো জোট গড়ে লড়তে চান না। বরং, কংগ্রেসকে দূরে সরিয়ে রেখে একটি ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ে তুলে নির্বাচনে লড়ার ইচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যে কারণে ইউপিএ নয়, বারেবারেই ফেডারেল ফ্রন্টের কথা বলছেন মমতা। এবং এই ফ্রন্টটির নেতৃত্বে যে তিনিই থাকতে চান, তাঁর রাজনৈতিক আচরণে সেটিই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এর কারণটি অস্পষ্ট নয়। ফেডারেল ফ্রন্টের নেত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরার অঙ্ক যে মমতা করেছেন— সেটা তৃণমূল নেত্রী নিজ মুখে না বললেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। ইতিমধ্যেই মমতার দল তৃণমূল কংগ্রেস আওয়াজ তুলে দিয়েছে— পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলতে গেলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেডারেল ফ্রন্টের নেত্রী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই এই বিলাসবহুল ব্রিগেড সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু হলো কী শেষ পর্যন্ত? পূর্ণ হলো কি তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রীর আশা? ব্রিগেড সমাবেশ সেরে ফিরে গিয়েই ফারুক আবদুল্লা, চন্দ্রবাবু নাইডু, এম কে স্ট্যালিনের মতো নেতারা বলে বসলেন, কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়া বিরোধী জোট সম্ভব নয়। ব্রিগেডের মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজনও বলে গেলেন না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিরোধী জোটের সর্বসম্মত নেত্রী। বিরোধী নেতারাই প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন, মমতার নেতৃত্ব তাঁরা অনেকেই মানতে রাজি নন, এমনকী ব্রিগেডের মঞ্চ আলোকিত করে বসলেও।

তাহলে ব্রিগেড সমাবেশের উপসংহারটি কী দাঁড়াচ্ছে? উপসংহারটি এই— সাত মন তেল পুড়লো ব্রিগেডে, কিন্তু রাধা নাচলো কই?

পুনশ্চ : কিছু বেয়াড়া সাংবাদিক, যাঁরা ব্রিগেডের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বলছেন, সমাবেশটি মোটেই ঐতিহাসিক হয়নি। কারণ, মাঠের অনেকটা অংশ নাকি ফাঁকাই ছিল। আমি অবশ্য এসব কুৎসায় কান দিইনি।

শত্রু এখন ঘরশত্রু

চন্দ্রভানু ঘোষাল

শত্রুঘ্ন সিনহা কি মিরজাফরের ইতিহাস জানেন? সম্ভবত জানেন না। একবার চোখ বুলিয়ে নিলে বুঝতে পারতেন মিরজাফরের সঙ্গে তাঁর যোলো আনা মিল। মিরজাফর ক্ষমতার জন্য দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, শত্রুঘ্নও দেশের আগমার্কা বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রকারান্তরে তাই করলেন।

কিন্তু কেন এরকম করলেন শত্রুঘ্ন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আগে জানতে হবে কেন তিনি রাজনীতি করতে এসেছিলেন। বরাবরই তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এক সময় হিন্দি সিনেমার সুপারস্টার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। যে কোনও কারণেই হোক, সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। সিনেমার নায়ক যে তিনি হননি, তা নয়। হয়েছেন কিন্তু সেসব ছবি দর্শকমনে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি। বরং তিনি খলনায়ক হিসেবে বেশি সফল। কিন্তু খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করে তো আর সুপারস্টার হওয়া যায় না। এদিকে বয়েসও বাড়ছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার ডাক সেভাবে আর আসছে না। তাহলে উপায়? একটা প্ল্যাটফর্ম তো চাই। প্ল্যাটফর্ম খুঁজতেই শত্রুঘ্নের রাজনীতিতে আসা। সেই সময় রামজন্মভূমি আন্দোলনের সুবাদে বিজেপির গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। সুতরাং বিজেপি অটোমেটিক চয়েস। যদিও জীবনের প্রথম নির্বাচনে শত্রুঘ্ন সতীর্থ রাজেশ খান্নার কাছে হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। অটলবিহারী বাজপেয়ী শত্রুঘ্নকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী করেছিলেন। পরে জাহাজ মন্ত্রীও হন। শত্রুঘ্নের প্রথম নির্বাচনী জয় ২০০৯ সালে। এরপর ২০১৪ সালে। ভেবেছিলেন নরেন্দ্র মোদীও তাঁকে মন্ত্রী করবেন। কিন্তু মোদী অন্য ধাতের মানুষ। কী করবেন আগে থাকতে ঠিক করে নিয়ে সেইমতো টিম তৈরি করে নেন। শত্রুঘ্নের মতো 'গলা আর বলা'-সর্বস্ব মানুষ সেই টিমে অচল। সুতরাং জায়গা হয়নি। ফলে শত্রুঘ্ন প্রথম থেকেই কট্টর মোদী বিরোধী।

সমস্যা হলো, দু-চারটে টুইট করে নরেন্দ্র মোদীকে চাপে ফেলে দেবেন এত বড়ো নেতা শত্রুঘ্ন নন। তাই তার একটি বিকল্প রাস্তার প্রয়োজন। সেই রাস্তার নামই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরণী। মমতা জানেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অবাঙ্গালি ভোটব্যাঙ্ক যথেষ্ট শক্তপোক্ত। শত্রুঘ্নকে সামনে রেখে তিনি সেই ভোটব্যাঙ্কে ধ্বস নামাতে চাইছেন। শত্রুঘ্ন শেষ পর্যন্ত দলত্যাগের সাহস দেখাতে পারলে কিংবা দল তাঁকে টিকিট না দিলে, মমতা হয়তো তাঁকে তৃণমূলের প্রচারে নামিয়ে দেবেন। কোনও নিরাপদ আসন থেকে জিতিয়েও আনতে পারেন। কিন্তু যাই করুন, মিরজাফরেরা শেষ পর্যন্ত মিরজাফরই থেকে যাবেন। সময়ের উত্থান-পতনে মাঝে মাঝে তাদের তুরুপের তাস বলে মনে হবে বটে কিন্তু সে মনে হওয়া ক্ষণিকের। খেলার শেষে জানা যাবে তুরুপের তাস জেতেনি, জিতেছে মানুষ। আর জিতেছে দেশ।

ঠগস অব হিন্দুস্থান

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চিটফান্ড কেলেঙ্কারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব থেকে বড়ো অবদান। তার মধ্যে সারদায় লুটের পরিমাণ ২৭০০ কোটি টাকা আর রোজভ্যালিতে ১০ হাজার কোটি টাকা। এই দুটি চিটফান্ড ছাড়াও আরও অন্তত এক ডজন চিটফান্ডের টাকায় পকেট ভর্তি করেছেন তৃণমূলের নেতারা। সব মিলিয়ে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে লুটের পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকা। নারদ স্টিং অপারেশনে প্রকাশ্যে এসেছে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতি। নানারকম সুবিধে পাইয়ে দেবার বিনিময়ে প্রকাশ্যে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ খেতে দেখা গেছে। সম্প্রতি ভাগাড়ের পচা মাংস বিক্রি নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজ্য। জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গে ভাগাড়ের মাংস ব্যবসার বার্ষিক লেনদেন ছিল ৩০০ কোটি টাকার। এই ব্যবসার মাথারাও তৃণমূল ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বাংলো তৈরি করিয়েছেন, খরচ পড়েছে ৭০০ কোটি টাকা। খোদ মমতা ব্যানার্জির ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণও নাকি প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। তাঁর দাদা এবং ভাইয়েরাও এখন কোটিপতি। এসব অবশ্য শোনা কথা। তবে যা রটে তার কিছুতো ঘটে!

অসুস্থ শরীরেও মালদা এসে দলকে উজ্জীবিত করে গেলেন অমিত শাহ

আদিনাথ ব্রহ্ম

একশো দুই ডিগ্রি জ্বর গায়ে নিয়ে দিল্লি থেকে উড়ে এসে মালদার জনসভায় আক্রমণাত্মক ভাষণ দিয়ে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, নেতৃত্বগুণে অন্যদের থেকে কেন তিনি স্বতন্ত্র। গত ২২ জানুয়ারি মালদহের জনসভায় দিন কয়েক আগেই বিজেপি সভাপতি সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। দিল্লির এইমস-এ তাঁকে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরাও তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলেন। এমন শারীরিক অবস্থা নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে সভা করতে আসতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে বিজেপি মহলেও দ্বিধা এবং সংশয় ছিল। কিন্তু সমস্ত সংশয় এবং অনিশ্চয়তা দূর করতে অসুস্থ শরীর নিয়েও বিজেপি সভাপতি দিল্লি থেকে উড়ে এলেন মালদা। এবং কানায় কানায় পূর্ণ ময়দানে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে উজ্জীবিত করে গেলেন দলীয় কর্মীদের। অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে এভাবে ছুটে আসার ভিতর দিয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা অমিত শাহ দিয়েছেন। তা হলো, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইটিকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই দেখছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিনা লড়াইয়ে যে তৃণমূল কংগ্রেসকে আর এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি নন বিজেপি নেতৃত্ব— অসুস্থ শরীরেও পশ্চিমবঙ্গে ছুটে এসে এই বার্তাই দিয়ে গিয়েছেন অমিত শাহ। এবং স্বাভাবিকভাবে, দলের সভাপতির এই মেজাজ যথেষ্ট উদ্দীপনা জুগিয়েছে সভায় আগত বিজেপি কর্মী এবং সমর্থকদের।

তাঁর পয়তাল্লিশ মিনিটের ভাষণে অমিত শাহ প্রথম থেকেই ছিলেন আক্রমণাত্মক মেজাজে। তাঁর ভাষণে তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন, অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন এবং বাংলাদেশ থেকে ইসলামিক সন্ত্রাসের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদান— এটিই এখন বিজেপির পাখির চোখ। অমিত শাহ বলেন, 'এই রাজ্যে একজনও অনুপ্রবেশকারীকে আমরা থাকতে দেব না। এই রাজ্য এখন সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে পরিণত হয়েছে। এ রাজ্যের মানুষ সকাল হলে রবীন্দ্র সংগীতের বদলে বোমার আওয়াজ শুনতে পায়।' তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী বিভিন্ন সভাসমাবেশে যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা বলে থাকেন, সেই অভিযোগও জনসভায় দাঁড়িয়ে খণ্ডন করেন বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন, 'ইউ পি এ আমলে এই রাজ্যকে পাঁচ বছরে দিয়েছিল ১ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকা। আর নরেন্দ্র মোদীর আমলে এই সরকার পেয়েছে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা।' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মমতার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বিজেপি সভাপতি বলেন, 'এত টাকা কোথায় গেল? আসলে জেহাদি পুষতে আর সিন্ডিকেটের পিছনে সব টাকা নয়-ছয় হয়ে গিয়েছে।' এই রাজ্যে যে গণতন্ত্র অবশিষ্ট নেই তাও স্মরণ করিয়ে দেন অমিত শাহ। বলেন, 'পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে একজন মানুষেরও মৃত্যু হয়নি। আর এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এত জন মারা গিয়েছেন। এখানে বিরোধীদের সভা-সমাবেশ পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না। তবে এবারের লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, আধাসামরিক বাহিনী এবং বি এস এফ দিয়ে ভোট হবে। তৃণমূলের গুন্ডামি চলবে না।' কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্য উল্লেখ করে বিজেপি সভাপতি বলেন, 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বাধা দিয়ে এখানে তৃণমূল সরকার নিম্নমানের রাজনীতি করছে।'

তবে বিজেপি সভাপতির এই জনসভাটি বানচাল করতে শাসক দল এবং জেলাপ্রশাসন আদাজল খেয়ে নেমেছিল। প্রথমে হেলিপ্যাড তৈরি নিয়ে জেলাপ্রশাসন নানারকম টালবাহানা করে। জনসভার দিনও রতুয়া, পুকুরিয়া, চাঁচল থেকে সভার অভিমুখে আসা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের আটকে দেয় পুলিশ। এত কিছু করেও অবশ্য জনজোয়ার আটকাতে ব্যর্থ হয় তারা। মালদা শহর লাগোয়া সাহাপুর সংলগ্ন ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। লক্ষাধিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির সামনে শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয় পুলিশ ও প্রশাসন। মালদার এই জনসভা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালে যথেষ্ট ভাঁজ ফেলবে আশা করাই যায়।

জ্ঞানের দেবী সরস্বতী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী— হে সরস্বতী, জননী তুমি। এ জগতে তোমার চেয়ে স্নেহময়ী, মমতাময়ী, করুণাময়ী আর কেউ নেই। জগতের সকল মায়ের সেরা মা তুমি। নদীর মধ্যেও তুমিই উত্তমা। দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি। তুমি দেবী সরস্বতী।

সেই সুদূর অতীতে এই ভাবেই দেবী সরস্বতীর বন্দনায় মুখর হন বেদের ঋষি। বেদের নানা সূক্তে— নানা মন্ত্রে এইভাবেই দেবীর স্তুতি গাওয়া হয়েছে। এই ভাবেই তিনি পূজা পেয়ে আসছেন যুগে যুগে।

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে— কমলনয়না তিনি জ্ঞানের দেবী। বিদ্যার দেবী। সংগীত, কলা এবং সবরকম শিল্পবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী তিনি। মহাপ্রজ্ঞার আধার তিনি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ত্রিদেব--- ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাঁদেরই শক্তিরূপিণী ত্রিদেবী সরস্বতী-লক্ষ্মী-পার্বতী। এই ত্রিদেবীর প্রথমা সরস্বতী সকলের চেতনাকে বিকশিত করেন। চৈতন্যময় জীব প্রজ্ঞার দীপশিখায় উদ্ভাসিত হয়ে নব-নব সৃজনে হয় উল্লসিত। আবার এই দেবীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলে অজ্ঞানতার ঘন অন্ধকারে দিশেহারা জীব দ্রুত এগিয়ে যায় চরম বিপর্যয়ের পথে— পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া শিলাখণ্ডের মতোই।

সরস্বতীর প্রচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় মহাগ্রন্থ বেদেই। বেদে তিনি দ্বি-রূপা। তিনি নদী। আবার তিনি দেবীও। দেবী রূপে জ্ঞানের বিভায় তিনি দূর করেন অজ্ঞান-তমিস্রার। জ্যোতির্ময়ী দেবী আপন জ্যোতিতেই দিশা দেখান সকলকে। নিজের তেজ-দীপ্তিতে তিনি আলোকময় করেন সবকিছু। সেই আলোকের ঝরনাধারায় পূর্ণ করেন স্বর্গ-মর্ত্যকে। তিনি সপ্তস্বসা বা সপ্তাবয়বা।

বেদের এই দেবী সরস্বতী 'পাবক' পবিত্রকারিণী। বুদ্ধির দ্বারা তিনি অন্ন উৎপাদনেও সক্ষম। তাই তিনি অন্নদাত্রী-অন্নপূর্ণা। যজ্ঞ-স্বরূপা তিনি যজ্ঞং বষ্টুধিয়াবসুঃ। সবরকম সত্যকর্ম এবং শোভনবুদ্ধির প্রেরণাদাত্রী এই বাগ্‌দেবী সরস্বতী। এই দেবীর কৃপাতেই সৃষ্টি হয়েছে সীমাহীন সুবিশাল জ্ঞান- মহাসাগর। কর্ম দ্বারা তিনি সকলকে চেতনা দান করেন। সকল শুভবুদ্ধির উদ্বোধনকারিণী— যজ্ঞের ধারণ-কর্ত্রী তিনি দেবী সরস্বতী। মহাসমুদ্রের মতো অসীম পরমাত্মাকে তিনি প্রকাশ করেন প্রতীকের মাধ্যমে। সর্বজনের হৃদয়ে করেন জ্যোতির সঞ্চার।

ঋগ্বেদে পাঁচটি সূক্তে রয়েছে দেবী সরস্বতীর স্তুতি। এর মধ্যে তিনটিতে (৬।৬১,৭।৯৫৪, ৭।৯৬) তাঁকে দেবী রূপে বন্দনা করা হয়েছে। বাকি দুটির একটিতে দুটি ঋকে এবং অন্যটিতে সরণ্যু, পূষ্যা, আপ প্রভৃতির সঙ্গে সরস্বতীর স্তুতি রয়েছে। কিন্তু এই স্তুতি কোনো সরস্বতীর উদ্দেশে— নদী, নাকি দেবীর? এমন প্রশ্ন উঠেই থাকে। তবে বেদের ব্যাখ্যাতা এবং ভাষ্যকারদের মতে দুটি অর্থেই সরস্বতীর কথা বলা হয়েছে। নিঘন্টুতে বাগ্‌দেবীর ৫৭টি এবং নদীর ৩৭টি নামের এক তালিকা রয়েছে। দুটি তালিকাতেই রয়েছে সরস্বতীর নাম। সায়নভাষ্যেরও এক জায়গাতে সরস্বতীকে নদী ও দেবী দুই রূপেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যাস্কও সরস্বতীর বাক্ ও নদী রূপ দুটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার থেকে বলা যায়, বেদের যুগে সরস্বতী বাগ্‌দেবী ও নদী দুই রূপেই পূজিতা হতেন। পরবর্তীকালে সরস্বতীর দেবী রূপটিই প্রাধান্য পায়।

ভাষ্যকাররা বলে থাকেন, পর্বত থেকে উৎপন্ন নদী সাগরের দিকে ধেয়ে যায় অপূর্ব এক গতিরঙ্গে। আবার গদ্যপদ্যময় রূপে বাগ্‌দেবীও ছন্দময়— গতিময়। মানুষ তার পরিকল্পিত সীমান্তে পৌঁছতে পারে একমাত্র দেবী সরস্বতীর কৃপাতেই।

ঋগ্বেদে স্পষ্টভাবে সরস্বতীকে বিদ্যার দেবী বলা না হলেও অথর্ব বেদে কিন্তু সরস্বতী যেন

বিদ্যাদায়িনী। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে তো সরাসরি তাঁকেই বাগ্‌দেবী বলা হয়েছে। বেদের সরস্বতী বা বাগ্‌দেবীই পুরাণে বিদ্যার দেবী রূপে বর্ণিতা হয়েছেন।

বেদে সরস্বতীর যে রূপ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, সরস্বতী হলেন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। তিনি পার্থিব এবং নানা বিদ্যার অধিকারী। বিশাল বৃক্ষের মতোই তিনি সকলকে আশ্রয় দেন। শরণাগতদের করেন অশেষ কল্যাণসাধন। তিনিই সকলকে বুদ্ধি দেন। পূরণ করেন সকলের সব কামনা-বাসনা। আরোগ্যকারিণী এই দেবীই সরস্বতী— অনমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে (ঋগ্বেদ ১০।১৭।৭৮)।

বরদা দেবী সরস্বতীর দানের কোনো তুলনা নেই। বিদ্যা-বিনয়- জ্ঞান দেন তিনি। তিনি কাউকে দেন পুত্র, কাউকে করেন অতুল বৈভবের অধিকারী। এই দেবীই হর্ষিদাতা বধ্র্যশ্বকে দিয়েছিলেন দিবেবদাথ নামে এক পুত্র। কৃপণ পণিকে শুচিশুদ্ধ করেছিলেন। মহাকাব্যের যুগে দস্যু রত্নাকরকে তিনি পরিণত করেন আদিকবি বাল্মীকিতে। মহাভারতকার ব্যাসদেবের লেখক গণেশকে তিনিই দোয়াত-কলম তথা লেখনী ব্যবহার করতে শেখান।

পরবর্তীকালে কালিদাসকে পরিণত করেন সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবিতে। বেদে সমস্ত কামনা পূরণকারী দেবী সরস্বতীর শান্তস্নিগ্ধ মূর্তির আড়ালে রয়েছে রুদ্রাণী রূপও। শাস্ত্র-গ্রন্থ ফেলে সেখানে তিনি শস্ত্রপাণি। তখন তিনি শত্রুনাশিকা। দেবতাদের নিন্দা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। দেব-নিন্দককে হত্যা করে শান্ত হতেন তিনি। ওই কারণেই তিনি বধ করে ত্বষ্টা-পুত্র বৃত্রকেও। শুধু বৃত্র নয়, বহু মায়াবী অসুরকেও বধ করেন তিনি একই ভাবে।

ঋগ্বেদে একবার তাঁকে জ্ঞানের দেবী বলা হলেও (১।১।১১)। বেদ পরবর্তীকালের পুরাণেই সরস্বতী দেখা দেন সবরকম বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে। সরস্বতীর উদ্ভব সম্পর্কে পুরাণ-কাহিনি, ব্রহ্মার জিহ্বা থেকে সরস্বতীর জন্ম। অপরূপা সেই দেবীর রূপ দেখে ব্রহ্মা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পিতার এই স্খলনে আপত্তি জানান মরীচি প্রমুখ ব্রহ্মার ছেলেরা। লজ্জায় ব্রহ্মা দেহত্যাগ করেন।

অন্য কাহিনি, পিতা ব্রহ্মা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় সরস্বতী লজ্জায় পালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তিনি যেদিকে যান সেদিকেই তাঁকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করেন ব্রহ্মা। চারদিকে এইভাবে তাকাতে তাকাতে ব্রহ্মা হন চতুর্মুখ। সরস্বতী তখন ঊর্ধ্বলোকে যান। কিন্তু তখনও তাঁকে দেখার জন্য ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকের উদ্ভব হয়। বাধ্য হয়েই সরস্বতী তাঁর কাছে ধরা দেন। তবে অভিশাপ দেন তাঁর ওই পঞ্চম মুণ্ডটি ছিন্ন হবে। স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্মার দুই স্ত্রীর নাম সাবিত্রী ও সরস্বতী। মৎস্যপুরাণে শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ব্রহ্মাণী ও সরস্বতী অভিন্ন।

এক পুরাণ কাহিনি, পরমাত্মার মুখ থেকে হয় সরস্বতীর আবির্ভাব। শুক্লা, বীণাপাণি, চন্দ্রের শোভাযুক্তা এই দেবী হন শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কবিদের ইষ্টদেবতা। সৃষ্টির সময় ইনি হন পঞ্চরূপা। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ইনি রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতীতে পরিণত হন। নিজের সত্ত্বগুণ থেকে উদ্ভূতা বলে ব্রহ্মা দেবীর নাম দেন সরস্বতী। বলেন, সকলের জিহ্বাগ্র হবে তাঁর বাসভূমি। একই সঙ্গে তিনি একটি রূপে ব্রহ্মার মধ্যে এবং পৃথিবীতে নদী হিসেবে প্রবাহিত হবেন বলে জানান।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, কৃষ্ণের কণ্ঠ থেকে হয় সরস্বতীর আবির্ভাব। কৃষ্ণ প্রথমে এঁর পূজা করেন এবং তারপর থেকেই মর্ত্যে তাঁর পূজার প্রচলন হয়। কৃষ্ণ থেকে জন্ম হলেও সরস্বতী তাঁকেই স্বামী হিসেবে চান। কৃষ্ণ তখন তাঁকে নারায়ণের ভজনা করতে বলেন। সেই ভজনার ফলেই সরস্বতী হন বিষ্ণুর স্ত্রী। সরস্বতী ছাড়াও বিষ্ণুর ছিল আরও তিন স্ত্রী। ফলে সপত্নীদের মধ্যে কলহ লেগেই থাকত। এমনই এক কলহের সময় সপত্নী গঙ্গার অভিশাপে সরস্বতী নদী রূপে প্রবাহিত হন এই পৃথিবীতে। পুরাণেই আছে, বিষ্ণুর চতুর্থ স্ত্রী সরস্বতীকে দান করেন ব্রহ্মাকে। আবার অন্য এক জায়গায় সরস্বতীকে শিবের কন্যা ও স্ত্রী হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

নদীরূপা সরস্বতীর তীরে মুনি ঋষিরা তপস্যা করতেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রর আশ্রম ছিল সরস্বতীর দুই বিপরীত কুলে। এই দুই ঋষির মধ্যে ছিল এক ধরনের বিরোধ। একবার বশিষ্ঠকে ভাসিয়ে তাঁর আশ্রমে আনার জন্য সরস্বতীকে নির্দেশ দেন বিশ্বামিত্র। বিপন্ন সরস্বতী বশিষ্ঠকে সব কথা বললে, তিনি তাঁকে বিশ্বামিত্রের নির্দেশ মতোই কাজ করতে বলেন। সরস্বতীও তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে আসেন বিশ্বামিত্রর আশ্রমে। বশিষ্ঠকে হত্যার জন্য বিশ্বামিত্র ভেতরে গেলে সরস্বতী আরেক বশিষ্ঠকে ফের ভাসিয়ে নিয়ে যান অপর পারে। সরস্বতীকে এমন কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র অভিশাপ দেন সরস্বতী শোণিত প্রবাহে পরিণত হবে।

বিশ্বামিত্রের এই অভিশাপের ফলে সরস্বতী ভরে ওঠে পূতি গন্ধময় রক্তে। বাধ্য হয়ে তপস্বীরা চলে যান অন্যত্র। কিছুদিন বাদে কয়েকজন মুনি এই অবস্থা দেখে মহাদেবের তপস্যা করতে থাকেন। তাঁরই কৃপায় সরস্বতী হন শাপমুক্ত।

সরস্বতীকে নিয়ে এমনই নানা কাহিনি রয়েছে বিভিন্ন পুরাণে। বিদ্যার দেবী হিসেবে সরস্বতী শ্বেতবর্ণা, শ্বেতভূষণা। তাঁর বাহন হংসও শ্বেতশুভ্র। দ্বিভুজা সরস্বতীর মূর্তিই এখন বেশি দেখা যায়। কিন্তু আদিতে তিনি চতুর্ভুজা। তাঁর চারটি হাত চারটি বেদের প্রতীক। আবার অন্যত্র আছে, এই চারটি হাত হলো মন, মেধা, সচেতনতা ও অস্মিতার প্রতীক। আবার তাঁর চার হাতে পুস্তক, বীণা ও অক্ষমালাও দেখা যায়। একই ভাবে, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে তাঁর বাহন হলো ময়ূর।

শুধু বঙ্গদেশ বা পূর্বভারত নয়, সারা ভারতবর্ষ এবং তার বাইরে নেপাল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী। সর্বত্রই তিনি পূজিতা সমানভাবে। জৈন ও বৌদ্ধরাও এই জ্ঞানের দেবীর আবাহন করেন তাঁদের মতো করে।

বঙ্গদেশে সরস্বতীর পূজা হয় মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে। ওইদিন তাই শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমী হিসেবেও খ্যাত। বাংলার বাইরে কোথাও কোথাও নবরাত্রির সময় সরস্বতীর পূজা করা হয়। বাংলাদেশে না থাকলেও বিশেষ করে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণের রাজ্যে একাধিক সরস্বতী মন্দিরে আজও দেবী পূজিতা হন সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে লক্ষ্মীপূজার কথা থাকলেও সেভাবে সরস্বতী পূজার বিধান নেই। তবে লেখনী মস্যাধার অর্থাৎ দোয়াত কলমের পূজার কথা আছে। ষোড়শ শতকের স্মৃতিকার, রঘুনন্দন এবং তাঁর পূর্ববর্তী বৃহস্পতি, রায়মুকুট শ্রীপঞ্চমীর দিনে সরস্বতী পূজার বিধান দিলেও গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কনাচার্যের মতে মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা বাংলার লোকাচার মাত্র।

ব্যাপারটা যাই হোক, বর্তমানে সরস্বতী পূজা বিদ্যার্থীদের কাছে এক অবশ্য পবিত্র ও আনন্দের অনুষ্ঠান। এই দিনটি তাদের কাছে শুধু বিদ্যাদেবীর পূজা নয়, মুক্ত হওয়ারও দিন।

ভারতের ছটি বিখ্যাত মহালক্ষ্মী মন্দির

শ্যামনন্দন

মহালক্ষ্মী মন্দির, কোলাপুর : এখানকার মহালক্ষ্মী মন্দির কেবল মহারাষ্ট্রের নয় সারা দেশের প্রসিদ্ধ লক্ষ্মী মন্দির। ঐতিহাসিকদের মতে সপ্তম শতকে চালুক্য বংশের শাসনকর্তা কর্ণদেব এই মন্দির নির্মাণ করেন। প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, এই মন্দির ৭০০০ বছরের পুরানো। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হলো ভগবান সূর্যদেব তাঁর কিরণ দিয়ে মা-লক্ষ্মীর পদসেবা করেন। মাঘ-ফাল্গুন মাসে সূর্যের কিরণ দেবীর পদ বন্দনা করে মধ্যভাগ হয়ে মুখমণ্ডলকে উদ্ভাবিত করে। তখন এক সুন্দর দৃশ্য তৈরি হয়।

শ্রীপূরম স্বর্ণমন্দির : তামিলনাড়ু রাজ্যের ভেল্লু জেলার শ্রীপূরম গ্রামে অবস্থিত মহালক্ষ্মী মন্দিরকে দক্ষিণের সূর্যমন্দির বলা হয়। ১০০ একর জুড়ে এই মন্দির ২০০৭ পর্যন্ত সাধারণের জন্য বন্ধ ছিল। বর্তমানে সবাই দর্শন করতে পারে। পলার নদীর তীরে অবস্থিত এই মন্দির ধর্মীয় দিক থেকে নয়, ঐতিহাসিক দিকেও গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (নিউদিল্লি) : ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লিতে অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুও পূজিত হন। মন্দির ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে বীরসিংহদেব তৈরি করেন। পরে ১৯৩৮-এ বিশিষ্ট শিল্পপতি জি. ডি. বিড়লা সংস্কার করেন। এই মন্দিরে জন্মাষ্টমী ও দীপাবলী উৎসব বিশেষ ভাবে পালিত হয়।

মহালক্ষ্মী মন্দির (ইন্দোর) : হোলকার রাজাদের আমলে ১৮৩২ সালে মলহার রাও হোলকার (২য়) এই মন্দির তৈরি করেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই মন্দিরে দেবী দর্শন করেন। পণ্ডিতদের মতে ইন্দোরের মলহারী মার্তণ্ড মন্দিরের সঙ্গে এই প্রাচীন মন্দিরের সুসজ্জিত প্রতিমা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

মহালক্ষ্মী মন্দির (মুম্বই) : মুম্বই

শহরের এই মন্দির প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। আরব সাগরের তীরে বি. দেশাই রোডে অবস্থিত এই মন্দিরটি লক্ষ লক্ষ মানুষের আস্থার কেন্দ্র। প্রতিদিন দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। এই মন্দিরে সম্পদের দেবী মহালক্ষ্মী প্রতিমার সঙ্গে মহাকালী ও মহাসরস্বতীর মূর্তিও রয়েছে। ভক্তদের

দৃঢ় বিশ্বাস এখানে এলে তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ হবে।

পদ্মাবতী মন্দির (তিরুচুরা) : অন্ধ্রপ্রদেশে তিরুপতির পাশেই তিরুচুরা গ্রামে দেবী পদ্মাবতীর সুন্দর মন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি, তিরুপতি মন্দিরে বালাজীর কাছে যে আশীর্বাদ চাওয়া হয় তা পূরণ হয় দেবী পদ্মাবতীর আশীর্বাদ পেলে। পৌরাণিক মতে পদ্মফুল থেকে দেবী পদ্মাবতীর সৃষ্টি হয়েছে, যা এই মন্দিরের পাশের দীঘিতে ফুটেছিল।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

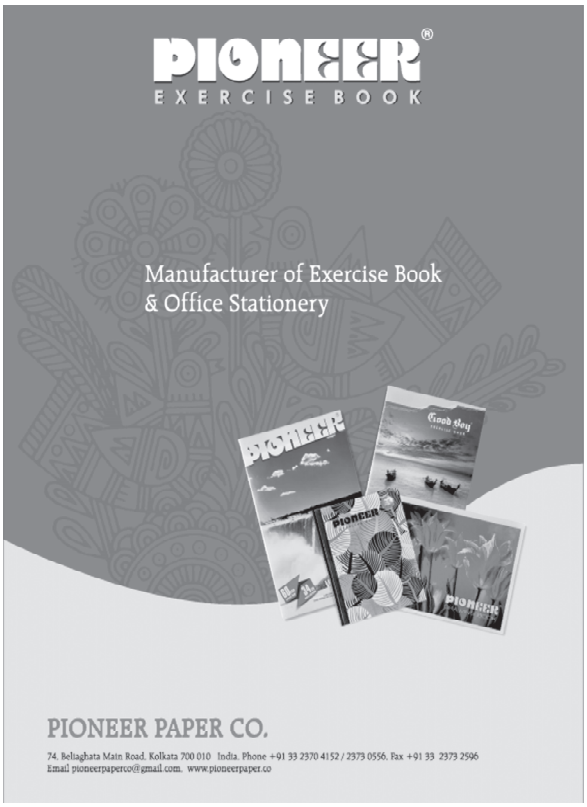

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

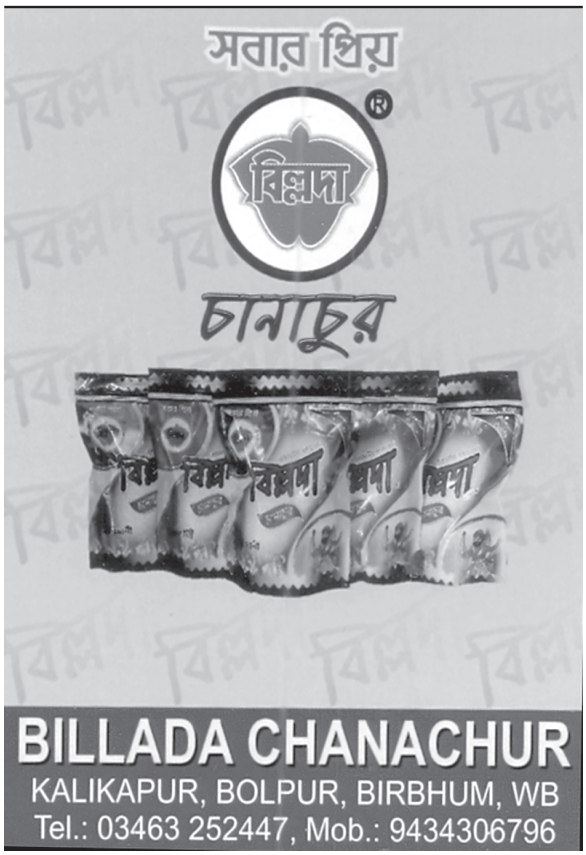

বাবরের প্রতি নেহরু-গান্ধী পরিবারের আনুগত্য গোপন ইতিহাসের ইঙ্গিতবাহী

রাম ওহরি

প্রিয় পাঠক, কখনও ভেবে দেখেছেন কি সুদূর আফগানিস্তানের কাবুলে গিয়ে নেহরু-গান্ধী পরিবারের সদস্যদের বাবরের কবর দেখার এত উৎসাহ কেন? এই পরিবারের এক সদস্য যিনি নিজেকে উপবীতধারী শিবভক্ত হিসেবে জাহির করেন, তিনিও গেছেন। কিন্তু বাবরের কবর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এক হিন্দু সম্রাটের সমাধি দেখতে কখনও যাননি।

আজকাল ইন্টারনেটে এমন সব তথ্য মেলে যা সচরাচর ইতিহাস বইয়ে পাওয়া যায় না। এই তথ্যভাণ্ডারে চোখ বোলালে বাবর এবং তার প্রবাদপ্রতিম নিষ্ঠুরতার প্রতি নেহরু-গান্ধী পরিবারের ভক্তিশ্রদ্ধার বিষয়টি কোনওভাবেই গোপন থাকে না। ব্লগারদের লেখায় একটা কথা প্রায়ই উঠে আসে। নেহরু-গান্ধী পরিবারের সদস্যরা বাবরের কবর দেখতে যাওয়া শুরু করেছেন ১৯৫৯ সাল থেকে। একথা সকলেই জানেন, আমাদের দেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী ইতিহাস যারা লিখেছেন তারা ইচ্ছে করেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বাদ দিয়েছেন। তাদের সব থেকে বড়ো ব্যর্থতা এটাই, তারা কখনও জানতে চাননি কেন বাবর এত দীর্ঘ সময় ধরে নেহরু এবং গান্ধী পরিবারের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস হয়ে রইলেন। মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পণ্ডিত নেহরু থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধীর বাবরের কবর দেখতে যাওয়া যে নিছক ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা নয়, সেটা নামীদামি সাংবাদিকরাও বুঝতে চাননি। যাই হোক, আলোচনার সুবিধার্থে কে কবে কাবুলে বাবরের কবর দেখতে গিয়েছিলেন একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

- নেহরু গিয়েছিলেন ১৯৫৯ সালে।
- নটবর সিংহের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধী যান ১৯৬৮ সালে। (নটবর সিংহের গ্রন্থ প্রোফাইল অ্যান্ড লেটার্স দ্রষ্টব্য)।
- ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী ১৯৭৬ সালে এক সঙ্গে একবার গিয়েছিলেন।
- রাহুল, ড. মনমোহন সিংহ এবং তাঁর বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ ২০০৫ সালের আগস্টে বাবরের কবর দেখতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম. কে. নারায়ণ। (সূত্র : নটবর সিংহের গ্রন্থ)

সুতরাং প্রিয় পাঠক, বাবরের প্রতি নেহরু ও গান্ধী পরিবারের এই নিঃশর্ত আনুগত্যের কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। জানা দরকার কেন তাঁরা লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ঘাতক এবং অসংখ্য মন্দির ধ্বংসকারী বাবরের প্রতি এতটা দায়বদ্ধ? এও জানা দরকার, কী করে তারা ভুলে গেলেন বাবরই ছিলেন অযোধ্যার রামজন্মস্থান মন্দির ধ্বংসের মূল পাণ্ডা?

নটবর সিংহের লেখা থেকে জানা যায়

কাবুলে বাবরের কবর।

১৯৬৮ সালে ইন্দিরা গান্ধী বাবরের কবরে (মাজারে) গিয়ে একান্তে প্রার্থনা করেছিলেন। এ ব্যাপারে দেশের ইংরেজি সংবাদমাধ্যম নীরবতা অবলম্বন করলেও হিন্দু ব্লগাররা চুপ করে থাকেননি। যদিও ২০০৫ সালে রাহুল গান্ধী এবং ড. মনমোহন সিংহের কাবুল ভ্রমণ ও বাবরের কবর দেখতে যাওয়ার প্রসঙ্গটি মিডিয়া সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারেনি। চণ্ডীগড়ের দ্য ট্রিবিউন পত্রিকার সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে রাহুল গান্ধী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহের সঙ্গে আমার কাবুল যাওয়া নিয়ে মিডিয়া অযথা জলঘোলা করছে।' তার বিরুদ্ধে কোনও কোনও মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাতে চরিতার্থ হয় তার জন্য তিনি সমাধিস্থলে অবস্থিত মাজারে প্রার্থনা করেন এবং প্রধান মুরশেদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাহুল এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। দ্য ট্রিবিউনের রিপোর্টিং থেকে আরও জানা যায়, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন, সঙ্গী হয়েছিলেন রাহুল। প্রেসিডেন্টের প্যালেস থেকে শুরু করে বাগ-এ-বাবরে বাবরের কবর, সর্বত্র তিনি ছিলেন ড. মনমোহন সিংহের সঙ্গী। তাঁকে যে-সব প্রশ্ন করা হয়েছিল তার বেশিরভাগেরই উত্তর দিয়েছিলেন, হয় বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ নয় তো জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম. কে. নারায়ণন।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো দ্য ট্রিবিউনের সাংবাদিক রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেননি, বাবরের প্রতি গান্ধী ও নেহরু পরিবারের এই অন্ধ আসক্তি কেন? কেন তারা বাবরের কবর দেখার জন্য বারবার কাবুলে ছুটে যান? সেটা কি মুঘল ঘাতকদের সঙ্গে গান্ধী পরিবারের গোপন যোগসূত্রের জন্য? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে রিতা গুপ্তা, আরুষি বহুগুণা এবং রামাধীরের মতো সাহসী ব্লগাররা যেসব নতুন প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলো বরাবর উপেক্ষা করা হয়েছে। নটবর সিংহকে কেউ প্রশ্ন করেননি, সমাধিস্থলে বসে ইন্দিরা গান্ধীর একান্ত প্রার্থনা কি মুঘলদের সঙ্গে গান্ধী পরিবারের ভাবগত নৈকট্যকে প্রতিষ্ঠিত করে না? অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার ড. মনমোহন সিংহকেও কোনও সাংবাদিক প্রশ্ন করেননি, কে তাকে বাবরের কবর দেখতে যেতে বাধ্য করেছিল? তিনি কি রাহুল গান্ধী? নাকি তিনি নিজেই যাওয়া মনস্থ করেছিলেন। প্রশ্নগুলো উঠছে কারণ শিখধর্মের মানুষ হওয়ার সুবাদে বাবরের কবর দেখতে যাওয়ার উদগ্র বাসনা ড. মনমোহন সিংহের থকার কথা নয়। একথা সবাই জানেন, নরঘাতক বাবরের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে কার্যত রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক। সুতরাং পরম্পরাগত শিক্ষা ভুলে ড. মনমোহন সিংহ স্বেচ্ছায় বাবরের কবর দেখতে গিয়েছিলেন, একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

পণ্ডিত নেহরুর লেখা থেকে জানা যায় তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাশ্মীরী হিন্দু। তাঁর প্রপিতামহের নাম পণ্ডিত রাজ কওল। ১৭১৬ সালে তিনি তৎকালীন মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের অনুরোধে দিল্লি চলে আসেন। নেহরু লিখেছেন তাঁর পিতামহ গঙ্গাধর নেহরু ছিলেন দিল্লির কোতোয়াল। কিন্তু কথাটি তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, কোনও মুসলমান শাসকই হিন্দুদের শহরের কোতোয়াল নিযুক্ত করেননি। ফারুকশিয়ার ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসক। তিনি এদেশের প্রতিটি হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে চাইতেন। এই ফারুকশিয়ারই বান্দা সিংহকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল্লিতে নিয়ে আসেন। সঙ্গে আনা হয়েছিল গুরু নানকের অসংখ্য হিন্দু এবং শিখ ভক্তের মুণ্ডহীন ধড়। বান্দা সিংহের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়েছিল। পরে হত্যা করা হয়। এক রাতে হত্যা করা হয় সাতশো শিখ সৈন্যকে। ফারুকশিয়ার এই নির্মম হত্যাদৃশ্য নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং উপভোগও করেছিলেন। এহেন ফারুকশিয়ার একজন কাশ্মীরী হিন্দুকে দিল্লিতে এসে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন, বিশ্বাস হয় না।

যেদিন নটবর সিংহ বাবরের কবরে ইন্দিরা গান্ধীর একান্তে প্রার্থনা করার কথা প্রকাশ করেছেন, সেদিন থেকেই এই পরিবারের শেকড় সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবী এবং ব্লগারদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। speakingtree.in/the stud নামের একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি ব্লগে (নাম : Hidden facts About the Nehru-Gandhi Dynasty) দাবি করা হয়েছে নেহরু বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন মুসসমান ভদ্রলোক, নাম গিয়াসুদ্দিন গাজি (গাজি শব্দের অর্থ যিনি ইসলামে অবিশ্বাসী কাফেরদের ঘাতক)। ১৮৫৭ সালে সিপাহি মহাসংগ্রামের সময় এই গিয়াসুদ্দিন গাজি ছিলেন দিল্লির কোতোয়াল। মুঘল আমলে হিন্দুকে নগর কোতোয়াল হিসেবে নিয়োগ করার পরম্পরা ছিল না। দিল্লি ছিল মুঘলদের রাজধানী শহর। সুতরাং দিল্লিতে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে একথা বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের দেশের মূলধারার ইতিহাস অনেকাংশেই বিকৃত। তাই গত কয়েক বছর ধরে অনেকেই প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধানে গবেষণায় ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁদের গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে ১৮৫৭ সালে দিল্লির কোতোয়াল ছিলেন গিয়াসুদ্দিন গাজি, গঙ্গাধর নেহরু নন। সিপাহি মহাসংগ্রামের পর ব্রিটিশ সৈন্য দিল্লির দখল নেয় এবং শহরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে খুঁজে খুঁজে মুসলমানদের হত্যা করে। বাহাদুর শাহ জাফরের পুত্রদেরও গলা কেটে হত্যা করা হয়েছিল। দিল্লির দরিয়াগঞ্জের নিকটবর্তী খুনি দরওয়াজা এখনও এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। এখানে ব্রিটিশ সৈন্যরা কয়েক শো মুঘলকে গলা কেটে এবং গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছিল।

বিকল্প ইতিহাসের গবেষকদের লেখা থেকে আরও জানা গেছে, ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে বন্দি হবার ভয়ে গিয়াসুদ্দিন সপরিবারে পলায়ন করেন। কিন্তু তার পরনে ছিল মুঘল রাজদরবারের পোশাক, যা দেখে ব্রিটিশ অফিসারদের সন্দেহ হয়। আগ্রায় তিনি ধরা পড়েন। গিয়াসুদ্দিনের উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। তিনি তার আসল নাম গোপন করে বললেন, তাঁর নাম গঙ্গাধর নেহরু। নিজের পরিচয় দিলেন কাশ্মীরী হিন্দু বলে। এই ঘটনার কথা প্রখ্যাত গবেষক এম. কে. সিংহ তাঁর তেরো খণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স (ISBN : 41-3745-9) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশের পর এক দশক অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত কেউ তাঁর দেওয়া এই তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করেননি।

আত্মজীবনীতে বাবর স্বীকার করেছেন তার প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের হত্যা করা এবং সারা দেশে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে দেওয়া। হিন্দু

পৃথ্বীরাজ চৌহানের সমাধি।

কাফেরদের হত্যা করে এবং তাদের মুণ্ড দিয়ে মিনার বানিয়ে তিনি কী বিপুল আনন্দ পেতেন সেকথা বাবর তুজুক-ই-বাবরির ছত্রে ছত্রে লিখে গেছেন। বাবরের নিষ্ঠুরতার সাক্ষী শিখ ধর্মগুরু গুরু নানকও। তিলং বাগ গুরু নানকের প্রথম শবদে তিনি লিখেছেন, 'মেয়েদের করুণ অবস্থা দেখে দুঃখ হয়।' বাবরের কামুক সৈন্যরা হিন্দু ও শিখ মেয়েদের ওপর চরম অত্যাচার চালাত (সূত্র : পোস্টকার্ড নিউজ, রিতা গুপ্ত)। তৃতীয় শবদে গুরু নানক লিখেছেন, 'রাগ আসা, মহলা ইক; অষ্টাপদী ঘর ৩। বাবরের সৈন্যরা মহিলাদের চুল কেটে মজা দেখত। গলায় ফাঁস পরিয়ে তাদের ওপর জঘন্য অত্যাচার করা হতো (সূত্র : ওই, আরুষি বহুগুণা)। ব্লগাররা জানিয়েছেন, বাবর তিনবার তার সেনাশিবির অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, স্থানীয় হিন্দুদের হত্যা করে মৃতদেহের পাহাড় বানিয়েছিল তার সৈন্যরা। কাফেরের রক্তের নদী দেখে আপ্লুত বাদশাহ শিবির স্থানান্তরিত করেছিলেন।

আর একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক খবর দিয়ে এই লেখা শেষ করব। গান্ধী পরিবারের সদস্যরা কাবুলে বাবরের কবর দেখার জন্য গেলেও, তার অনতিদূরে গজনিতে হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের সমাধি দেখতে কখনও যাননি। পরিবারের বাররপ্রীতির ইতিহাসে হিন্দু সম্রাটের প্রতি চরম উপেক্ষার প্রসঙ্গটি কোথাও আলোচিত হয়নি। এর একটা প্রধান কারণ পৃথ্বীরাজ চৌহানের সমাধি যে আফগানিস্তানে সেকথা বেশিরভাগ ভারতীয় জানেনই না। স্থানীয় আফগানরা প্রতিদিন সমাধিস্থলে এসে তাদের ক্ষোভ উগরে দেয়। তাদের ধারণা পৃথ্বীরাজ চৌহানই মহম্মদ ঘোরীকে নমাজ পড়ার সময় হত্যা করেছিলেন। ৯০০ বছর কেটে গেছে তবুও আফগানদের অজ্ঞতা ঘোচেনি (সূত্র : আর্মস অ্যান্ড আরমার : ট্র্যাডিশনাল ওয়েপনস অব ইন্ডিয়া; লেখক : জয়ন্ত পাল)। গজনির উপকণ্ঠে দুটি চূড়াবিশিষ্ট সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। বড়োটি মহম্মদ ঘোরীর আর ছোটটি পৃথ্বীরাজ চৌহানের।

শেষবার যখন জয়ন্তবাবু গজনিতে যান তখন তার চোখের সামনে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছিল। তিনি লিখেছেন, 'পৃথ্বীরাজ চৌহানের দেহাবশেষ যেখানে আছে তার ওপর রয়েছে একটি মাটির সমাধি। এর খুব কাছেই ঝুলছে একটি দড়ি। দড়িটি চূড়া থেকে নেমে মোটামুটি কাঁধের উচ্চতায় এসে শেষ হয়েছে। স্থানীয় আফগানরা প্রতিদিন প্রায় নিয়ম করে এসে ওই দড়ি ধরে এক পায়ে দাঁড়ান, তারপর জোরে লাথি মারেন পৃথ্বীরাজের সমাধিতে'। ভারতের বীর সম্রাট এই বিজাতীয় ঘৃণায় কষ্ট পান কিনা জানি না কিন্তু জয়ন্তবাবু বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

গান্ধী পরিবার এই আফগান পরম্পরার কথা জানে না তা নয়, কিন্তু তারা কখনও গজনিতে যাননি। বাবরকে নিয়েই মেতে থেকেছেন। এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানের সময় এসে গেছে। জানা দরকার তাদের এই সীমাহীন বাবরপ্রীতি এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের প্রতি নির্মম উপেক্ষার কারণ কী! নয় তো স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অন্ধকারে থেকে যাবে।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস অফিসার। সৌজন্য : অর্গানাইজার)

বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহ

বিজ্ঞানের তিনটি প্রধান শাখা এই দেশে প্রথম প্রবর্তন করার জন্য তিনজন বাঙ্গলি বিজ্ঞানীকে আমরা ভুলতে পারি না। এঁরা হলেন সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ (১৮৬৭-১৯৫৩), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৮৯৩-১৯৭২) ও বীরেশচন্দ্র গুহ (১৯০৪-১৯৬২)। সুবোধচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে 'শারীরবিদ্যা বিভাগ' চালু করেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রশান্তচন্দ্র 'পরিসংখ্যানবিদ্যা' শুরু করেন। আর বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহ ১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জীবরসায়ন' বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৪ সালের ৮ জুন বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বনেদি পাড়ায় বীরেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবা রাসবিহারী গুহ খুবই কৃতী ও সুপরিচিত মানুষ ছিলেন। বীরেশচন্দ্রের মামা ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শিক্ষাবিদ অশ্বিনীকুমার দত্ত। মামার মূল্যবোধ ও আদর্শ বীরেশচন্দ্রের জীবনে সঞ্চারিত হয়েছিল। দাদুর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রজমোহন স্কুলে বীরেশচন্দ্র প্রথম লেখাপড়া শুরু করেন। পরে ১৯১৮ সালে কলকাতায় এসে শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায় ভর্তি হন। ভালোভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে সিটি কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হন এবং আই.এস.সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন।

এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে ভর্তি হন। সেসময় দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এসে ভর্তি হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে রসায়নে অনার্স-সহ পাশ

করেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হন এবং ১৯২৫ সালে এম.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এমএসসি পাশ করে বীরেশচন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে এক বছর বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করেন এবং তাঁর আগ্রহ ও প্রেরণায় গবেষণার জন্য বিলেত যান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যাক ড্রুমন্ডের কাছে ভিটামিন-বি নিয়ে কাজ করেন। তারপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেডেরিক হপকিন্সের কাছে কাজ করেন। এই সময় বীরেশচন্দ্র বিশ্বসেরা কয়েকজন বিজ্ঞানীর সান্নিধ্য ও পরামর্শ পেয়েছেন।

১৯৩২ সালে বীরেশচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন। চাকরি না পেয়ে আবার কিছু দিন বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করেন। ১৯৩৬ সালে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে 'রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক' পদে যোগ দেন। এদেশের নানা খাবার বিশ্লেষণ করে তার খাদ্যগুণাগুণ লিপিবদ্ধ করে যান। ১৯৪৪ সালে তিনি ভারত সরকারের খাদ্য উপদেষ্টা পদে যোগদান করেন। দেশের মানুষের অপুষ্টি নিরসনের জন্য তিনি 'খাদ্য মিশ্রণ' তৈরি করেন। কিছুদিনর মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন যে, পরিচালকবর্গের অপুষ্টি দূর করার সদিচ্ছা নেই। তাই পদত্যাগ করেন।

চালের পুষ্টিমূল্য কেমন, কতটা সেদ্ধ করলে তার খাদ্যগুণ নষ্ট হয় না, নোনা জল ও মিষ্টি জলের মাছের তফাত কোথায় এসব নিয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা রয়েছে। ঘাস ও পাতা থেকে প্রোটিন নিষ্কাষণ করেন তিনি, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতা সেই খাবার জনপ্রিয় হতে দেয়নি।

অপুষ্টি ও অনাহার আজও আমাদের দেশ থেকে দূর হয়নি। হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে একবিংশ শতকের ভারতবর্ষে। রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের ঔদাসীন্য আমরা বুঝতে পারি। সমাজের কোন পরিস্থিতিতে কেমন ভূমিকা একজন বিজ্ঞানীকে গ্রহণ করতে হয়, বীরেশচন্দ্রের জীবন থেকে তা স্পষ্ট অনুভূত হয়। তাঁর প্রতি নতুন প্রজন্মের দায় আরও বেশি। ১৯৬২ সালের ২০ জুন মাত্র ৫৮ বছর বয়সে অনেক স্বপ্ন ও কাজ অপূর্ণ রেখে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। সেই ভার আমাদেরই বহন করতে হবে।

শ্যামল চক্রবর্তী

ভারতের পথে পথে

মুম্বাই

অসুরদলনী ব্যাঘ্র আসীনা প্রাচীন মুম্বমাতার নামানুসারে এই জনপদের নাম মুম্বাই। ব্রিটিশ ও পর্তুগিজদের মুখে তা বোম্বাই হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৫ সালে মুম্বাই তার পুরনো নাম ফিরে পেয়েছে। ২৭৩ থেকে ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মুম্বাই ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কোলাবা, ফোর্ট, বাইকুল্লা,প্যারেল, ওরলি,মাতুঙ্গা ও মহিম– এই সাতটি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে ৫ বর্গকিলোমিটার ব্যাপ্ত বৃহত্তর মুম্বাই। এই শহরকে ভারতের বাণিজ্য নগরী বলা হয়। এখানকার গণেশ চতুর্থী উৎসবে দূরদুরান্ত থেকে পর্যটক আসেন। এছাড়া জন্মাষ্টমী, দশেরা, দীপাবলী পালিত হয় সাড়ম্বরে। এখানকার দর্শনীয় স্থান হলো গণপতি মন্দির, ইন্ডিয়া গেট, শিবাজী পার্ক, মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিলস, বালকেশ্বর শিবমন্দির, তারাপোলওয়ালা অ্যাকোরিয়াম, জৈন মন্দির, মহালক্ষ্মী মন্দির, আরবসাগরের বুকে এলিফ্যান্টা দ্বীপ প্রভৃতি।

জানো কি?

- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কুখ্যাত জেনারেল ডায়ারকে গুলি করে হত্যা করেন উধম সিংহ।
- ভারতের মশলা উদ্যান বলা হয় কেরল রাজ্যকে।
- ভারতে শিবাজী উৎসবের সূচনা করেন বাল গঙ্গাধর তিলক।
- আলিপুরদুয়ার জেলার টোটোপাড়াতে ভারতের বিরলতম উপজাতি টোটোদের বাস।
- ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ২২ টি ভাষাই রাষ্ট্র ভাষা।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

ভালো কথা

নির্মাল্যকাকুর নেংটি ইঁদুর

বাবার সঙ্গে সেদিন নির্মাল্যকাকুর বাড়ি গিয়েছিলাম। চা খেতে খেতে কাকুর সঙ্গে যখন বাবা গল্প করছিল তখন পায়ের কাছে কয়েকটা নেংটি ইঁদুর ঘুর ঘুর করছিল। কাকু বিস্কুট ভেঙে ওগুলোকে খেতে দিচ্ছিল। মনের আনন্দে ওরা বিস্কুট খাচ্ছিল। একটুও ভয় করছিল না। বাবা বলল, এগুলি কি আপনার পোষা নাকি? জিনিসপত্র কেটে শেষ করে ফেলে না? কাকু বলল, জিনিসপত্র কাটবে কেন? ওদের যাওয়া-আসার পথে বাধা সৃষ্টি না হলে কিছু কাটে না। সারাদিন বাড়িতে যে চালটা, ডালটা, মুড়ি, বিস্কুটের টুকরো পড়ে সেগুলো খেয়ে ঘর পরিষ্কার রাখে। এমনকী পোকামাকড়ও খেয়ে ফেলে। তবে ব্যবহারের আগে থালা-বাটি, কাপ-প্লেট সব ধুয়ে নিতে হয়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জানো, জগতের কোনো প্রাণীই ফেলনা নয়। সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভগবানের জীব। কাউকে মেরে ফলার অধিকার তোমাকে কেউ দেয়নি। এর নামই জীববৈচিত্র্য।

রণজয় দাস, অষ্টম শ্রেণী, পাণ্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) হ ক বা ধা র	(১) ক্ষা প রী নি ক্ষা রী
(২) সি না র্জ কা গ	(২) না চ্ছে দ বি দ বে

২১ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) ব্যায়মাগার (২) রসমালাই

২১ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) সাগরাভিযান (২) ষোড়শোপচার

উত্তরদাতার নাম

(১) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান (২) আলাপন দলই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (৩) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। (৪) ???????

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ৮।।

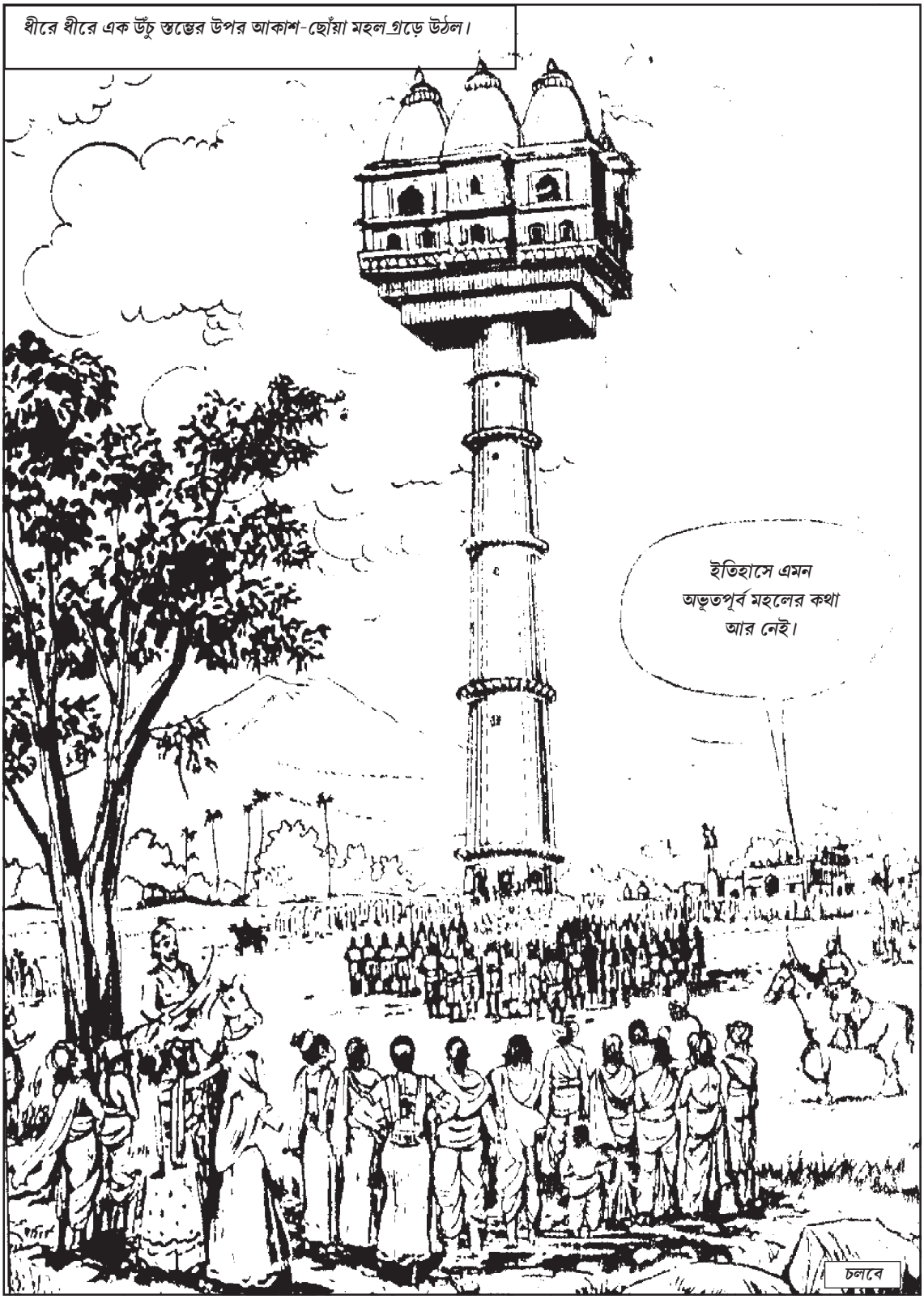

অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার মস্তিষ্ক বিকলাঙ্গের ঝুঁকি বাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বর্তমানে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মারাত্মক ভাবে স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের আসক্তি বেড়ে গিয়েছে। যার ফলে তাদের এডিএইচডি (অ্যাটেনশন ডিফিসিট/ হাইপার অ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার)- তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে। এটি ব্রেনের নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার বা বিকলাঙ্গ মস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ উদাহরণ, যা আপনার সন্তানের সাফল্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে প্রচণ্ড পরিমাণে প্রভাবিত করে। এর সাধারণ লক্ষণগুলি হলো আগ্রাসন মনোভাব, স্নায়বিক অস্থিরতায় ভোগা, অন্যমনস্কতা, বিরক্তবোধ, সংযমের অভাব, শব্দ ও কাজের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি, অমনোযোগতা, বিষন্নতা ও শেখার আগ্রহ কমে যাওয়া। আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটি জার্নালে কম বয়সিদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটি ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে তুলে ধরা হয়েছে উঠতি বয়সি ছেলে-মেয়েরা খুব বেশিমাত্রায় সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইনে ভিডিয়ো দেখা, ডাউনলোড করা, টেক্সট মেসিজিং, অনলাইন চ্যাটরুম, ভিডিয়ো কলিং, মিউজিক ডাউনলোড ও বিভিন্ন অনলাইন মোবাইল অ্যাপলিকেশন-সহ ২০ রকম কাজের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে।

ইউ এস-এর সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অ্যাডাম লিভেনথাল তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন বেশ কয়েক বছর আগে স্মার্টফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস যতটা পরিমাণ ব্যবহার করা হতো তার থেকে বেশ কয়েকগুণ বেশি এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। আগে সোশ্যাল মিডিয়া বা মোবাইল অ্যাপের এতটা বাড়বাড়ন্ত ছিল না। আগে সাধারণ মোবাইলের অ্যাপলিকেশনের তুলনায় এখনকার অ্যাপলিকেশন অনেক জটিল ও সংক্রামক ব্যবহার হচ্ছে। যা ইন্টারনেটের সাহায্যে মানুষের শরীর ও মাথার অনেক ক্ষতি সাধন করছে। নতুন মোবাইল টেকনোলজির সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহারের

ফলে চার পাশে উচ্চ তীব্রতা সম্পন্ন যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা কয়েক বছর আগের ব্যবহৃত স্মার্ট ফোনের তরঙ্গের থেকে তীব্রতায় প্রায় পাঁচগুণেরও বেশি। যা সরাসরি ব্রেনে আঘাত করে ও মস্তিষ্কের নতুন কোষ সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়।

এডিএইচডি কিশোর-কিশোরীদের মাথার মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলছে তা পরীক্ষা করার জন্য একদল বিজ্ঞানী লসঅ্যাঞ্জেলেসের দশটি নামকরা পাবলিক স্কুলের পনেরো-ষোলো বছরের ৪১০০ ছাত্র-ছাত্রীর ওপর একটি সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা গেছে, ২৫৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রী এডিএইচডি-তে পুরোপুরি আক্রান্ত এবং ৫০০ জন কমপরিমাণে আক্রান্ত। তারা এই ছাত্র-ছাত্রীদের টানা দু'বছর পর্যবেক্ষণে রাখে ও প্রতি ছ'মাস অন্তর একটি রিপোর্ট তৈরি করে। যারা দৈনিক আট ঘণ্টা বা তার বেশি পরিমাণে সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্যান্য মোবাইল অ্যাপলিকেশন ইন্টারনেটের সাহায্যে ব্যবহার করে, তারা খুব তাড়াতাড়ি ছ' মাসের মধ্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। যারা মাঝারি পরিমাণে সোশ্যাল মিডিয়া বা মোবাইল অ্যাপলিকেশন ব্যবহার করছে তাদের আক্রান্ত হতে দুই থেকে তিন বছর সময় লাগছে। এদের মধ্যে ৯.৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী শুধুমাত্র ডিজিটল মিডিয়া ব্যবহার করত। ১০.৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী শুধু মাত্র মোবাইল অ্যাপলিকেশন ইন্টারনেটের সঙ্গে ব্যবহার করত এবং ৩০ শতাংশ ইন্টানেটে সঙ্গে ডিজিটাল মিডিয়া শুধুমাত্র সার্ফিং করত। আর যারা ইন্টারনেটের সঙ্গে ডিজিটাল মিডিয়া ও মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার খুবই কম সপ্তাহে এক থেকে দু'বার করেছে তাদের মধ্যেও ৪.৬ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এডিএইচডি-তে আক্রান্ত।

কোনো ছাত্র যদি নবম শ্রেণী থেকেই ডিজিটাল মিডিয়া ও অন্যান্য অ্যাপলিকেশন এমনকী মোবাইলে সাধারণ গেমে আক্রান্ত হতে শুরু করে তাহলে সেই ছাত্রের মধ্যে একাদশ শ্রেণীতে এডিএইচডি-র লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। দ্বাদশ শ্রেণীতে পুরোপুরি আক্রান্ত হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে আগামীদিনে কম বয়সিদের উন্নত মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে ডিজিটাল মিডিয়া যে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। এডিএইচডি নতুন প্রজন্মের কাছে মারাত্মক ঝুঁকির সৃষ্টি করছে।

এটিকে সমূলে বিনাশ করা এখনো কোনোভাবে সম্ভব হয়নি। তবে ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে। অনেকে বিভিন্ন জায়গায় মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিলেও সেখানে ঝুকির পরিমাণ থেকেই যাচ্ছে। ■

দ্রৌপদীর হাত ধরে জীবনের মূল স্রোতে সিকিমের দিব্যাঙ্গরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের নতুন নাম দিয়েছেন দিব্যাঙ্গ। কিন্তু কেন এই নামকরণ? প্রধানমন্ত্রীর এই নতুন নামকরণের উদ্দেশ্য, প্রতিবন্ধী মানুষদের বোঝানো যে তারা শারীরিক দিক থেকে অসম্পূর্ণ হলেও তাঁদের মন অসম্পূর্ণ নয়। কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মতো তাঁদের জীবনও ঈশ্বরের প্রেম এবং কৃপার অধিকারী। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর মতে জীবন অনেক বড়ো। কোনও সমাজই একজন মানুষকে শুধু তিনি প্রতিবন্ধী বলে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে বাধা দিতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর ভাবনার প্রতিফলন অনেকের কাজের মধ্যেই আমরা দেখেছি। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল একজনের। তিনি সদ্য পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত দ্রৌপদী ঘিমিরে। দ্রৌপদী সিকিমের মানুষ। পাহাড়ের সরল সহজ অধিবাসীরা তাকে মায়ের মতো দেখে। বিশেষ করে দিব্যাঙ্গরা। তাঁরা জানেন, তাঁদের জন্য সব দরজা বন্ধ হলেও দ্রৌপদীর দরজা খোলা থাকবে। এবং একবার ওর কাছে যেতে পারলে এই অসম্পূর্ণ জীবনও একটা দিশা খুঁজে পাবে। দ্রৌপদীও সেটা জানেন। তাই তো তিনি গত তিন দশক ধরে দিব্যাঙ্গদের জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন সিকিম বিকলাঙ্গ সহায়তা সমিতি। এ বছর কেন্দ্রীয় সরকার দ্রৌপদীর মহামানবিক প্রয়াসকে সম্মান জানিয়েছে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করে।

কী ধরনের কাজ করেন দ্রৌপদী এবং তাঁর সংস্থা সিকিম বিকলাঙ্গ সহায়তা সমিতি? তাঁর সংস্থা কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সাহায্য করে, বয়েসের কারণে অস্থিক্ষয় হলে, চিড় ধরা হাড়ের চিকিৎসার উপযোগী অস্ত্রোপচারের আয়োজন করে। এবং তা করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এছাড়া যা করে সেটা হলো, দিব্যাঙ্গদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন। এখনও পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাধিক মানুষ সমিতি আয়োজিত শিবিরে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগরায়ণ যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ছোটোবড়ো দুর্ঘটনা। যার মধ্যে প্রধান আগুন লাগা। দ্রৌপদীর সমিতি অগ্নিদগ্ধ মানুষের চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করে। এই উদ্যোগের ফলে উপকৃত অনেকেই।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ আর এমন কী! এসব তো আমরা ভারতের ছোটোবড়ো নানান শহরে আকছার দেখি। কিন্তু কলকাতা- মুম্বই-চেন্নাইয়ের মতো শহর আর সিকিম এক নয়। সিকিমে পরিকাঠামো কোথায়? যদি ধরেও নেওয়া যায় আগেকার থেকে এখন পরিস্থিতির অনেক উন্নতি রয়েছে, কিন্তু তারপরও প্রশ্ন উঠবে, যা আছে তা কি যথেষ্ট? অবশ্যই না। দ্রৌপদী সেকথা মানবেন না। যা নেই তা তিনি তৈরি করে নেবেন। কিন্তু অজুহাতের গণ্ডীর মধ্যে আটকে থাকবেন না।

আটকে থাকেনওনি। অত্যন্ত দক্ষ এবং পেশাদারি মনোভাবাপন্ন একটি টিম তৈরি করেছেন। পুরস্কার পাবার পর সেই সম্মান টিমের সদস্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে দ্রৌপদী বলেন, 'আমাদের বড়ো কিছু করার দরকার নেই। ছোটো ছোটো পদক্ষেপেও অনেক দূর যাওয়া যায়। আমি কখনও পুরস্কার পাব বলে কাজ করিনি। কিন্তু এই পুরস্কার পেয়ে আমি এবং আমার টিমের প্রতিটি সদস্য সম্মানিত। এই পুরস্কার অসহায় দিব্যাঙ্গদের জন্য আরও ভালো কাজ করতে আমাকে উৎসাহ দেবে।'

সেবাকে নানান দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন দ্রৌপদী। একবিংশ শতকে সেবা কোনও একমাত্রিক কাজ নয়। এর বহু দিক, বহু অনুষঙ্গ। বহু বৈধ এনজিও নিরন্তর সমাজ সেবার কাজ করে চলেছে। এগিয়ে এসেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় উদ্যোগপতিরাও। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের যথার্থ রূপায়ণই এদের সকলের লক্ষ্য। দ্রৌপদীর সংস্থা সিকিম বিকলাঙ্গ সহায়তা সমিতিও একটি নথিবদ্ধ এনজিও। এই সংস্থা কৃত্রিম পা তৈরির কাজ শুরু করেছে। যার ব্র্যান্ডনেম মেড ইন গ্যাংটক। জয়পুরে তৈরি কৃত্রিম পা অনুপ্রাণিত করেছে দ্রৌপদীকে। বিদেশি মূলধন কাজে লাগিয়ে তিনি এখন সিকিমেই কৃত্রিম পা তৈরি করে বিনামূল্যে দিচ্ছেন অসহায় দরিদ্র দিব্যাঙ্গদের। সেই সঙ্গে তৈরি করছেন আরও অনেক কৃত্রিম অঙ্গ, যার সুফল ভোগ করছেন স্থানীয় মানুষ।

জীবনযন্ত্রণা থেকে কীভাবে একজন যোদ্ধার জন্ম হয় তার উদাহরণ দ্রৌপদী ঘিমিরে। চার দশক আগে তিনি অসম রাইফেলস পরিচালিত একটি হাসপাতালের আয়া। পচন ধরে যাওয়ার ফলে দ্রৌপদীর বাবার একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে যান মানুষটি। বাবার কষ্ট সহ্য করতে পারেননি দ্রৌপদী। প্রতিজ্ঞা করেন, ওর বাবার মতো যারা সব থেকেও নিঃস্ব, তাদের জন্য কিছু করবেন। সেই কাজই তিনি করে চলেছেন। ■

সাধারণ হিন্দুর প্রধান শত্রু সেকুলার হিন্দুরা

তরুণ বিজয়

হিন্দুরা বিতাড়িত হলে যাবে কোথায়? পৃথিবীর একটিমাত্র দেশ ভারতবর্ষ যেখানে আজও হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে। কিন্তু সেখানেও পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক- মানসিক আঘাত , অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে। স্বাধীন ভারতে এমন একটি রাজ্য আছে যেখান থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হয়েছে। সেইসব হিন্দু শরণার্থী হয়ে ভারতের অন্য রাজ্যে বসবাস করছে। তাঁরা নিজ ভূমেই পরবাসী হয়েছে। তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার জন্য ভারত সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। গণতান্ত্রিক ভারতেই হিন্দুদের এই অবস্থা, তাহলে সাংবিধানিক ভাবে ঘোষিত ইসলামিক দেশ পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা আফগানিস্থানে হিন্দুদের অবস্থা কী হচ্ছে , তা কখনো ভেবে দেখেছেন? দিল্লি ও অন্যান্য রাজ্যের রাজধানী শহরে জাঁকজমক পূর্ণ বিলাসবহুল অট্টালিকায় থাকা হিন্দু ও অহিন্দুরা তা কীভাবে বুঝবেন? পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে থাকা হিন্দু ও শিখদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই পার্থক্য শুধুমাত্র ভারতেই রয়েছে। সেখানে রামায়ণ, গীতা, গ্রন্থসাহেব একই স্থানে রাখা হয়। এভাবেই সেখানকার হিন্দু ও শিখবন্ধুরা বেঁচে থাকার রসদ পায়। পেশোয়ার, করাচি, কর্তারপুরের মতো জায়গায় অথবা বালুচিস্থানের কাছে মিট্টি, লাসবেলার মতো এলাকাতে গুটিকতক হিন্দু ও শিখ থাকলেও ইদানীং সেখানে হিন্দু মা-বোনেদের অপহরণ করে জোর করে বিয়ে ও বিভিন্ন ভাবে ইসলামিকরণ যেন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোদী সরকারের নাগরিকত্ব বিল শুধুমাত্র সেই অ-মুসলমান সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য যাদের একমাত্র আশা এবং আশ্রয় হলো ভারত। পাকিস্তানের খ্রিস্টান সমাজের অধিকাংশ খ্রিস্টানই হিন্দু বাল্মীকি সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত। আমি লাহোর, করাচি ও মীরকোটে এমন হিন্দু মা-বোনদের সাথে দেখা করে এসেছি যাঁরা ঘরের বাইরে বেরানোর সময় কপালে টিপ, গলায় মঙ্গলসূত্র পরে বেরোতে পারেন না। করাচির কাছে ক্লিফটন সাগরতটে একটি বিখ্যাত শিব মন্দির রয়েছে, সেখানে আজও মন্দিরের পুরোহিত মন্দিরের ভিতরে অর্ধচন্দ্রাকার তুর্কি টুপি পরে থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু যদি সেই হিন্দুদের অন্য কোনো দেশে আশ্রয় নিতে হয় তাহলে তারা ইরান,সৌদি আরব বা কুয়েতে কি নাগরিকত্ব পাবেন? এঁরা বছরের পর বছর আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেকে ও নিজের ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে স্বাধীনতার ৭০ বছর পর ভারতে এমন এক জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী হলেন যিনি এই ধরনের হিন্দু, শিখ ও খ্রিস্টানদের দৈনিক অপমান ও প্রতারণার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নাগরিকপঞ্জি বিল আনার সাহস দেখিয়েছেন। এই বিল সর্বদলীয় সম্মতি লাভের পরিবর্তে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে।

ভারতে নাগরিকত্ব আইন পাশ করা হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। সেখানে ভারতে আসা সমস্ত শরণার্থীকে অবৈধ নাগরিক হিসেবে ঘোষিত করা হয়েছে। তাদের বৈধ পাশপোর্ট বা অন্য কোনো কাগজপত্র নেই অথবা মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তাঁরা এদেশে থেকে গিয়েছেন। এখন এই অনুচ্ছেদে আরও একটি সংশোধনী পঙ্‌ক্তি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে

ফঃ ৬

বলা হয়েছে – 'আফগানিস্তান, বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন , পার্শি বা খ্রিস্টান এদেশে এসেছেন, যাঁরা ১৯২০-র পাশপোর্ট আইনের ৩ ধারা বা উপধারা ২ থেকে ছাড় পেয়েছেন অথবা ১৯৪৬-র বিদেশি নাগরিক আইন থেকেও ছাড় পেয়েছেন তাঁরা এই আইনের বলে বিদেশি বলে গণ্য হবেন না।'

মুসলমান ভোট হারানোর ভয়ে নাগরিকপঞ্জির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে। এটি অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, বিপদে পড়া নিজ ধর্মের বন্ধুদের শুধুমাত্র ভোটের লোভে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার বিরোধিতা করা হচ্ছে। আর হিন্দুদের বিপদে পাশে দাঁড়ানোয় মুসলমানরা কেন চিন্তিত হচ্ছেন? তাঁদের তো প্রায়শ্চিত্ত করতে আরও বেশি করে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। গত জুলাই মাসে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তান-সহ ৭১ টি দেশ থেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য ৪০৪৪ টি আবেদনপত্র বিবেচনাধীন রয়েছে। আবেদনপত্রগুলি ধর্মের ভিত্তিতে কোনোরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হয়নি। সারা দেশে ৭৬৮৫ জন বিদেশির সময়সীমা পার হওয়ার পরও ভারতে থেকে যাওয়ার তথ্য সামনে এসেছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে নাগরিকত্ব আইন চালু থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোনো প্রদেশে বিশেষ কোনো চাপ পড়ছে না। ভেবে দেখার সময় এসেছে যে অসম, অরুণাচলের মতো রাজ্যগুলির সমস্যা সর্বস্বান্ত হয়ে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখেদের জন্য, না উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের জন্য?

সব কাজ সবাই করতে পারেন না। তিরুবল্লুবরের 'তিরুক্কল', সুদর্শনের 'হার কী জিত', প্রেমচন্দের 'গোদান', নরেন্দ্র কোহ্লির 'রামকথা' – এক একটি রচনাই তাঁদের অমর করে রাখার জন্য পর্যাপ্ত। তাঁদের আরও রচনা রয়েছে, কিন্তু সেগুলি না থাকলেও তাঁদের মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতো না। ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে বিজয়, অটলবিহারী বাজপেয়ীর পোখরানে পরমাণু পরীক্ষণ তাঁদের অমর করে রেখেছে। তেমনি নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের জন্য কোটি কোটি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বব্যাপী হিন্দুদের ভারতের প্রতি আস্থা অর্জনের জন্য নরেন্দ্র মোদীকে দেশবাসী সদৈব স্মরণ রাখবে। ভারত হিন্দুস্থান এটা যেমন সত্য, তেমনি ভারত হিন্দুদের দেশ এটাও ততখানিই সত্য। আজকের কিছু হিন্দু যাঁরা নয়া রাষ্ট্রীয়তার ঝান্ডা উড়িয়ে অর্থ ও ক্ষমতার দ্বারা নির্বাচনী সমীকরণ করে দেশের অবস্থা বিগড়ে ফেলছেন, তাঁরা ভারতকে চিনতে ও জানতে সমর্থ হচ্ছেন না। তাঁরা ভাবতেই পারছেন না যে এই ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য লালকেল্লার সামনের চৌরাস্তায় এই দেশের মহাপুরুষরা নানান অত্যাচার সহ্য করে তাঁদের প্রাণ বলিদান দিয়েছেন। তাঁদের কারোর মাথা করাত দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে কাটা হয়েছে, কাউকে ফুটন্ত তেলে ডুবিয়ে মারা হয়েছে, কারো সারা শরীরে তুলো জড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, কাউকে গরম সাঁড়াসি দিয়ে গায়ের মাংস খুবলে নিয়ে মারা হয়েছে।

এটা সেই দেশ— যে দেশের মানুষ যারা ১৮ বার দিল্লির নরসংহার, লুণ্ঠন ও দেশবাসীকে উদ্বাস্তু হতে দেখেছে। এখানে সোমনাথ মন্দির বার বার ধ্বংস করা হয়েছে এবং আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেখেছে। কিন্তু এই আত্মবিস্মৃত জাতির দেশে দাসত্বের উৎসব শুধু ধুমধাম করে পালন করা হয় না, বরং সেই দাসত্বের প্রতীকগুলিকে অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের করের টাকায় রক্ষা ও শোভাবৃদ্ধি করা হয়। আমরা ভুলে গিয়েছি সেই মহরৌলীর যুদ্ধের কথা, যখন কুতুবুদ্দিন আইবকের সেনাপতি হিন্দু ও জৈনদের ২২ টি মন্দির ধ্বংস করছিল এবং অত্যাচারিত হিন্দু ও জৈনদের স্ত্রী ও শিশুদের আর্তনাদে আকাশ পর্যন্ত কেঁদে উঠেছিল। সেই সব মন্দিরের মালমশলায় তৈরি কুতুবমিনার স্বাধীন ভারত সরকার ও দিল্লি প্রশাসনের মর্যাদার প্রতীক রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেখানে কুতুব উৎসব হয় সেখানে পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের প্রায় আবছা হয়ে যাওয়া নীল-সাদা পাথরে কিছু লেখা ভয়ে ভয়ে জানান দিচ্ছে যে, এই মিনার ২২ টি মন্দির ধ্বংস করে তার মশলায় তৈরি করা হয়েছে।

হিন্দুদের শুধু ভারত থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে না, আফগানিস্তান, বালুচিস্তান, মুলতান, পেশোয়ার, করাচী, লাহোর বন্নু, বহাবলপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, কর্তারপুর, সিলেট, ঢাকা এবং চমন (যেখানকার আঙুর আজও দিল্লির বাজারে বিক্রি হয়) থেকে হিন্দুদের মেরেধরে, মহিলাদের বলাৎকার ও ধর্মান্তরিত করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আফগানিস্তানের নাম ছিল উপগণস্থান এবং সূর্য মন্দির ও সূর্যপূজার জন্য মুলতানের নাম ছিল মূলস্থান। বাপ্পা রাওলের নামে রাওয়ালপিণ্ডি। আজও পাকিস্তানের পর্যটন বিভাগের প্রচার পত্রিকায় লাহোর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ করা হয়। কাবুলের কুভা নদীর তীরে অসংখ্য শিব মন্দির ছিল। আফগান হিন্দুরা পরাক্রম ও বীরত্বের জন্য বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। বালুচ ও পাঠান হিন্দুদের পরাক্রম আজও সেখানকার লোককথার বিষয়। কিন্তু কারণ অন্য কিছু ছিল। বহু বছর পরাক্রমের সঙ্গে মুসলমান আক্রমণকারীদের ঠেকিয়ে রাখা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ কলহে হিন্দুরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরাজিত হয়। তখনই হিন্দুর সংখ্যা কমে যায় ও উৎখাত হয়। আফগানিস্তানের পাহাড়ের নাম হিন্দুদের বীরত্বের নামে না হয়ে হিন্দুদের পরাজয়ের প্রতীক স্বরূপ হিন্দুকুশ রাখা হয়েছে।

নাগরিকত্ব আইন কোনো দৃষ্টিতেই কোনো ভারতীয়ের অধিকারকে খর্ব করবে না বা প্রভাবিত করবে না। লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান অসমে হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে অসম বিভাজনের একশো বছরের পুরনো ষড়যন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ অসম, পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে বসে গেলেও সেকুলার বন্ধুদের তাতে কোনো চিন্তা হয় না। অর্থনৈতিক কারণে তারা দেশে এসেছে বলে তাঁরা মড়াকান্না করে চলেছেন। কিন্তু ভীষণ ইসলামি অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হিন্দুরা যখন নিজের প্রাণ ও স্ত্রী-কন্যার সম্মান বাঁচাতে এদেশে শরণ নেয় তখন তার বিরোধিতায় সেকুলার হিন্দুরা শুধু একপায়ে খাড়া হয়েই যান না, বরং অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে থাকেন।

এ কীরকম দেশভক্তি, ধর্মভক্তি ও মানবতা? ভারতে অনুপ্রবেশকারী ফিলিস্তিনি, তিব্বতি, রোহিঙ্গিয়া মুসলমান, বাংলাদেশি মুসলমানদের স্বাগত জানিয়ে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শরণার্থী হিন্দুদের জন্য দরজা বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ভারতের সেকুলার হিন্দুরাই একথা বলছে, তাই এর থেকে বড়ো দুর্ভাগ্যের কথা আর কিছু হতে পারে না।

(লেখক রাজ্যসভার পূর্বতন সাংসদ)

মূর্খকে শক্তি দ্বারা বশ করা অবশ্য কর্তব্য

প্রীতীশ তালুকদার

শ্রীমান রাহুল গান্ধীকে রাফাল গান্ধী বললে কি খুব ভুল হবে? সংসদে ও ততোধিক সংসদের বাইরে তিনি রাফাল নিয়ে তৎপর। 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে', তা মোগলের হাতে পড়লে খানা খেয়ে পার পাওয়া যায়, মূর্খের হাতে পড়লে জীবনটাই নরক। সংসদ চলছে, উত্তেজিত যুবরাজ জামার হাতা গুটিয়ে ঘাড় কাত করে একটা অডিও টেপ শোনাতে উদগ্রীব। এবার তিনি নাকি রাফাল দুর্নীতির অকাট্য প্রমাণ এনেছেন। বাঃ! দারুণ কথা, এমনটাই তো চাই। স্পিকার সুমিত্রা মহাজন জানতে চাইলেন : অডিও টেপটা নকল নয়, আসল, তার আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন তো? জামার হাতা ঝুলে পড়ল, উত্থিত লেজটা বীরবিক্রমে গুটিয়ে গেল, রাহুল গান্ধী আসনস্থ হলেন। অর্থাৎ রাহুল গান্ধী জানেন তিনি নকল টেপ নিয়ে এসেছেন। যারা অত বড়ো বড়ো জালিয়াতি করে আসছে কয়েক পুরুষ ধরে, মানে ও কারবারে কুলীন তাদের কাছে একটা অডিয়ো জাল তো নস্যি মশায়! পরেরদিন ফের একই প্রশ্ন।

বিরোধীদের প্রশ্ন থাকতেই পারে। আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে কিছু গোপনীয়তা থাকে। যা জানানো সম্ভব তা প্রধানমন্ত্রী নিজে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, বিদেশমন্ত্রী সুসমা স্বরাজ সংসদে ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতিরক্ষা সচিবালয় তথ্য দিয়েছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সব কিছু পরীক্ষা করে ক্লিনচিট দিয়েছেন এবং অভিযোগকারীদের তিরস্কার করে 'কাল্পনিক অভিযোগ' বলেছে। জেটলিজী তথ্য তুলে ধরেছেন। তবুও অভিযোগ।

রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের দাবি, তারা ১২৬টা রাফালের চুক্তি করেছিল, তার মধ্যে ১৮টা রেডি আর বাকিগুলো দেশে তৈরি হবে। কিন্তু কংগ্রেস টানা দশ বছর ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও রাফালের একটা চাকাও ভারতে পৌঁছায়নি। একশো বছরেও তারা পারবে না।

অত টাকাও কী সরকারের কাছে ছিল? ভাঁড়ারে যখন টান তখন নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালে ফ্রান্সে গিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন, ২০১৬ সালের অক্টোবরে সমস্ত অস্ত্র-সহ ৩৬টা বিমানের চুক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে সব বিমান ভারত পেয়ে যাবে। হ্যালে'র বদলে আম্বানির কোম্পানি কেন তাও সরকার পরিষ্কার করে বলেছে। ভারত সরকারের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি হয়েছে ফ্রান্স সরকারের। বিমান নির্মাণকারী সংস্থা এদেশে কাকে অফসেট অব্লিগেশনের জন্য পছন্দ করবে তাদের বিষয়। তাছাড়া হ্যালের সে পরিকাঠামোও নাই। দেশীয় প্রযুক্তির হালকা ও ছোটো বিমান তেজস উৎপাদনেই তারা গতি আনতে পারছে না, তা ছাড়াও আরও অনেক অর্ডার তাদের দেওয়া আছে যা তাদের পূর্ণ করতে হবে। মোদী সরকার হ্যালের পরিকাঠামো বিস্তারের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন যা কং-সরকার করেনি।

দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশের ক-জন মানুষ আর সংসদের অধিবেশন শোনেন! তাই পোয়াবারো চোরেদের। চোরের সাগরেদ খবর-ওয়ালারা মনে করেন তাদের ইচ্ছা মতো খবর মানুষকে গেলানো যায়। তাই তারা সরকারের দেওয়া তথ্য লুকিয়ে লাগাতার রাহুল গান্ধী ও তার অভিযোগ গুলোকে তুলে ধরতে ব্যস্ত।

লজ্জা করা উচিত তাদের যারা মোদীজীর মতো ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীরূপে পেয়েও মিথ্যা কাদা ছেঁটায়, অপবাদ দেয়। মোদীজীর ভাই-বোন আত্মীয়রা যেমন যেখানে ছিল সেখানেই তারা চায়ের দোকান, রেশন দোকান চালিয়ে, শিক্ষকতা করে নিম্ন মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের জীবন চালান। মোদীজীর সংসার নেই, নিজের খাওয়া খরচটাও নিজের মাইনের পয়সা দিয়ে চালান। এক দিনও ছুটি নেননি। সময় বাঁচাতে রাতের বিমানে চলাফেরা করেন। ভোট রাজনীতির তোয়াক্কা না করে দেশের স্বার্থে নোটবন্দি, জিএসটি, তিনতালাক রদের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বুক ফুলিয়ে। ভারত তো কলঙ্কময়, পৃথিবীর ইতিহাস থেকে একটাও এমন আদর্শ রাজনেতা ও প্রধানমন্ত্রীর উদাহরণ কী কেউ দেখাতে পারবেন?

দশচক্রে ভগবানকেও ভূত বানিয়ে দেওয়া যায়। তাই এসো, হাতে হাতে ধরি ধরি...। দেশের প্রচারমাধ্যম সত্য চেপে রাহুল গান্ধীকে তুলে ধরছে। শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতারা অসহনশীলতার বাহানা শুরু করেছে। ওরা টাকা খেয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। কংগ্রেসের তাঁবেদার দুর্নীতিগ্রস্ত ফারুক আব্দুল্লা, মেহেবুবা মুফতি থেকে শুরু করে অখিলেশ মায়াবতী হয়ে মমতা কারাত ওয়াইসি পর্যন্ত চার দিক থেকে ঘিরে ধরতে চাইছে। ওদের জমিদারি আর লুঠের রাজত্ব যেতে বসেছে, তাই সব এক গোয়ালে। কিন্তু বিজেপির শরিকরা চুপ কেন? বিজেপিতে ভারতের যোগ্যতম নেতারা আছেন, তাঁরাও ততটা আক্রমণাত্মক নয়। শিবসেনার ভূমিকা ভালো নয়। ঘাটতি কোথাও তো আছে। বিদ্বানকে প্রশংসা দ্বারা, লোভীকে ধন দ্বারা, মূর্খকে শক্তি দ্বারা বশ করা কর্তব্য। এটা চিরন্তন রাজনীতি। মোদীজী সেদিকে নজর দিলে ভালো করবেন। ভালো কাজের জন্যও আরও ক্ষমতায় থাকতে হবে। যারা রামমন্দির নিয়ে খড়্গহস্ত তারাও মনে রাখুন, অন্যেরা রামমন্দির ধ্বংস করবে। শুধু পাঁচ বছরে ভারত উদ্ধার হবে না, সময় চাই। ■

ভয় দেখিয়ে ইভিএম মাধ্যমে ভোট বানচাল করা যাবে না : মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার সুনীল অরোরা সম্প্রতি ইভিএম-এর বিরোধিতায় ব্যস্ত বিরোধীদের একহাত নিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন বিরোধীদের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কালিমালেপন কোনোভাবেই নির্বাচনী আয়োগকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। বিরোধীরা যেন কখনই না মনে করে যে তাদের এই লাগাতার মিথ্যে অভিযোগে ভয় পেয়ে কমিশন পুনরায় ব্যালট পদ্ধতি ভোট প্রক্রিয়ায় ফিরে যাবে। অতি সম্প্রতি তথাকথিত সাইবার জালিয়াত সৈয়দ সুজার বিগত লোকসভা নির্বাচন ইভিএম-এ কারচুপির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্পূর্ণ অভিসন্ধিমূলক অভিযোগ মুখ থুবড়ে পড়ায় কমিশন তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে। কমিশনার জানিয়েছেন যে আয়োগ সর্বদাই সমালোচনা, উপদেশ ও রাজনৈতিক দলগুলির পরামর্শ গ্রহণে উৎসুক। কিন্তু তার

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার সুনীল অরোরা

অর্থ এই নয় যে কোনো চোখ রাঙানির কাছে তারা মাথানত করে পুরনো ব্যালট বক্স পদ্ধতিতে ফিরে যাবে।

এই সূত্রে কমিশনের আবেদনের ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশ সুজার অভিযোগ নিয়ে ফৌজদারি মামলা দাখিল করেছে। 'আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সকলকে নিয়ে ও সকলের আয়ত্তের মধ্যে' এই সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন ইভিএম-কে বিরোধীরা বর্তমানে ফুটবলে পরিণত করেছে যেখানে ফল পক্ষে গেলে মেশিন ঠিক, আর বিপক্ষে গেলেই মেশিন ভুল।

উদাহরণ দিয়ে অরোরা বলেন, ২০১৪ সালে আমরা একরকম ফলাফল পেয়েছিলেন। মাত্র চারমাস পরে ২০১৫ সালে সেই ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল এল দিল্লির প্রাদেশিক নির্বাচনে। এই সূত্রে খেদ ব্যক্ত করে অধিকর্তা বলেন এর পর হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও সর্বশেষ ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এক এক ক্ষেত্রে এক একরকম ফলাফল হয়েছে যা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের।

সম্প্রতি কলকাতার এক বড়ো সমাবেশ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের ব্যালট পদ্ধতিতে ফিরে যাবার আবদার কমিশন নস্যাৎ করে দিয়েছে।

সুইজারল্যান্ড সরকার মাল্যর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য পাঠাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সুইস সরকার অনতিবিলম্বেই ভারত ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অর্থনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত বিজয় মাল্যের সেখানকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির হিসেব নিকেশ সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। সিবিআই-এর বরিষ্ঠ আধিকারিক রাকেশ আস্তানা যিনি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছিলেন তাঁকে নিয়ে মাল্য আপত্তি জানিয়েছেন। সুইজারল্যান্ডের সর্বোচ্চ আদালতে মাল্যের কৌসুলি বলেন যেহেতু আস্তানার বিরুদ্ধে ভারতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাই এই সংক্রান্ত মামলা স্থগিত করে অ্যাকাউন্টের বিশদ হিসেব জানানো বন্ধ রাখা হোক।

সিবিআই ইতিপূর্বে সুইস কর্তৃপক্ষকে মাল্যর বিশেষ চারটি অ্যাকউন্টে লেনদেন বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছিল। জেনিভার সরকারি আইনি প্রতিনিধি গত ১৪.৮.১৮-য় উল্লেখিত চারটি খাতা বন্ধ করেই ক্ষন্ত হননি, আরও বাড়তি তিনটি অ্যাকাউন্টের তথ্য তালাশও ভারতের গোচরে আনতে রাজি হয়েছেন।

শুধু তাই নয়, সুইস আধিকারিকদের ভাষায় ''দ্বিপাক্ষিক আইনি সহায়তার ক্ষেত্রে

বিজয় মাল্য

সর্বোচ্চ সহযোগিতার প্রমাণ রাখতে তাঁরা আরও এমন ৫টি কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশও ভারতকে দেবে যেখানে মাল্যর স্বার্থ জড়িত আছে।'' এই তৎপরতার খবর পেয়েই কৌশলী মাল্য এই ধরনের মহাগুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আদান প্রদান রুখতে সুইস সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁর অভিযোগ ভারতের তদন্ত প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্ত নয়, কেননা তাঁর মামলায় তদন্তের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে।

চাপ বাড়তে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপিয়ান কনভেনশন-এর ৬নং ধারা প্রয়োগ করে আদালতকে তিনি ন্যায্য বিচার থেকে যাতে বঞ্চিত না হন বা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত যেন দোষী বলে বিবেচিত না হন, সেদিকে নজর রাখার আর্জিও জানিয়েছেন।

রামমন্দির মামলার শুনানি পিছিয়ে দিল আদালত, ক্ষুব্ধ সারাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ছয় দশকের পুরনো রামমন্দির মামলার শুনানি সর্বোচ্চ আদালত আরও একবার পিছিয়ে দিল। ২৯ জানুয়ারির শুনানি হয়নি। তার কারণ পাঁচ বিচারককে নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চের অন্যতম সদস্য এস এ বোবড়ের অনুপস্থিতি। বছরের শুরু থেকেই রামমন্দির মামলা অবাঞ্ছিত বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। গত ১০ জানুয়ারির প্রস্তাবিত শুনানি জাস্টিস উদয় উমেশ ললিত অনুপস্থিত থাকার কারণে বাতিল হয়। তারপর আইনজীবী রাজীব ধাওয়ান সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের হয়ে মামলা লড়তে চলে যান। এই মামলায় প্রধান অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাবরি মসজিদ মামলায় তিনি আদালতের অবমাননা করেছিলেন। পরবর্তী শুনানির দিন স্থির হয় ২৯ জনুয়ারি। এরপর কবে শুনানি হবে সেই বিষয়ে আদালত কিছু জনায়নি। নতুন যে বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে তাতে জাস্টিস অশোক ভূষণ এবং এস. আবদুল নাজির, জাস্টিস এন. ভি. রামান্না ও ইউ.ইউ. ললিতের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এদিকে যোগগুরু বাবা রামদেব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে রামমন্দির নির্মাণ শুরু করার দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, 'রামমন্দির নির্মাণের জন্য হয় সরকার নয় তো আদালত অবিলম্বে কোনও সদর্থক ব্যবস্থা নিক। আদালত চাইলেই এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার জন্য সরকারকেও আরও উদ্যোগী হতে হবে।' ক্রমাগত শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র আদালতের কাছে আবেদন করেছে, বাবরি ধাঁচা যে জমির ওপর ছিল বিতর্ক সেই জমিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু নরসিংহ রাও সরকার যে ৭০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল সেই জমি নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। সুতরাং ওই ৭০ একর জমি বৈধ মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। উল্লেখ্য, আদালত যদি কেন্দ্রের আবেদন মঞ্জুর করে তাহলে মন্দির নির্মাণে বড়ো ধরনের কোনও বাধা থাকবে না। এখন আদালত কী করে সেটাই দেখার। এমনিতেই আদলতের অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। কারণ কংগ্রেস নেতা এবং আইনজীবী কপিল সিবাল আবেদন করেছিলেন আদালত যেন রামমন্দির মামলা সংক্রান্ত কোনও রায় নির্বাচনের আগে না দেয়। বারবার শুনানি পিছিয়ে দিয়ে আদালত কংগ্রেসের নির্বাচনী স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বলে সারা দেশে অভিযোগ উঠেছে। আদালত যদি অবিলম্বে অবস্থান না বদলায় তাহলে বিচারব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা যে টলে যাবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট
দেশে কমছে গরিব মানুষের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শহর এবং গ্রামের দরিদ্রতম মানুষের সংখ্যা আগের থেকে কমেছে। যেসব তথ্য সরকারের কাছে তা থেকে পরিষ্কার গ্রামে বসবাসকারী এই ধরনের মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ আর শহরে ৩.৫ শতাংশ। কংগ্রেস দেশ থেকে গরিবদের ছেঁটে ফেলতে চাইলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কিছু সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।' দিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্প্রতি এ কথা বলেছেন প্রভাস জাভড়েকর। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি ওয়ার্ল্ড ডেটা ল্যাব, গ্লোবাল মাল্টি ডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স এবং ব্রুকিং থিঙ্কট্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখ করেন। গ্লোবাল মাল্টি-ডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স অনুযায়ী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি রূপায়ণে ভারতের পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো। দৈনিক রোজগার ১৩৫ টাকার কম, ভারতে এরকম মানুষের সংখ্যা ছিল ২৬ কোটি। কিন্তু এখন সংখ্যাটা কমে হয়েছে ৫ কোটি। এই ৫ কোটি মানুষের জন্য সরকার নানারকম সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রভাস জাভড়েকর বলেন, 'ওয়ার্ল্ড ডেটা ল্যাব, গ্লোবাল মাল্টি ডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স এবং ব্রুকিং থিঙ্কট্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমছে এবং দেশ থেকে দারিদ্র্য খুব শীঘ্রই বিদায় নেবে। কিন্তু দারিদ্র্য এতদিন থাকল কেন? প্রশ্নটা কিন্তু ভেবে দেখার মতো। দীর্ঘদিন চাষিরা তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পাননি। চল্লিশ বছর ধরে তারা লড়াই করছেন।

স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ফসলের উৎপাদন-মূল্যের দেড়গুণ দাম চাষিদের পাওয়া উচিত। কংগ্রেস কোনওদিন কথাটা ভেবে দেখেনি। মোদী সরকার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' ব্রুকিং থিঙ্কট্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে প্রত্যেক মিনিটে ৪০ জন মানুষ দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উঠে আসছেন। সেলফ্ হেল্প গ্রুপগুলি এ ব্যাপারে সরকারকে প্রভূত সাহায্য করেছে। সারা দেশে ২ লক্ষ সেলপ্ হেলপ্ গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এদের মাধ্যমে ২ লক্ষ কোটি টাকা গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

উপকূল এলাকায় 'সি ভিজিল' সামরিক মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নৌ-বাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনী গত ২২ ও ২৩ জানুয়ারি দেশের উপকূল এলাকায় অবস্থিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা এবং মৎস্যজীবী ও উপকূল এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে 'সি ভিজিল' নামে বড়ো মাপের একটি সামরিক মহড়ায় যৌথভাবে অংশ নেয়। দেশের ৭,৫১৬.৬ কিলোমিটার উপকূল বরাবর এই ধরনের বিশাল মহড়া এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর এবং উপকূলরক্ষী বাহিনীর ৩০টি জাহাজ ও বিমান তথা পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরী থেকে অংশ নেওয়া নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকা মোট ৮৫টি টহলদারি নৌকা মহড়ায় অংশ নেয়। মেরিন পুলিশের নৌকাগুলি উপকূল থেকে ৫ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত টহল দেয় এবং নৌ-বাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজগুলি মহড়া চলাকালীন গভীর সমুদ্রে টহলদারি করে। নৌ-বাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিমান সারাক্ষণ আকাশ থেকে নজরদারি জারি রাখে। উপকূল এলাকায় নিরাপত্তার পন্থা-পদ্ধতি যাচাই করে নিতে, সমুদ্রপথ দিয়ে অনুপ্রবেশ রোধ করতে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির যৌথ দল মহড়ায় অংশ নেয়। প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, জাহাজ চলাচল, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, মৎস্যচাষ, বহিঃশুল্ক মন্ত্রক, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকার এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের বেশ কয়েকটি সংস্থা যৌথভাবে এই মহড়ার আয়োজন করে।

রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার বিজয়ীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৪ জানুয়ারি নতুন দিল্লিতে ২০১৯-এর রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার বিজয়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুরস্কারজয়ী শিশুরা তাদের বিশেষ সাফল্য এবং অনুপ্রেরণাদায়ক নানা ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে অংশ নেয়। প্রধানমন্ত্রী এই পুরস্কার জয়ী শিশুদের অভিনন্দন জানান এবং প্রশংসা করেন। শ্রী মোদী বলেন, মেধাবী শিশুদের স্বীকৃতি জানাতেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এমনকী, এই পুরস্কার অন্যান্য শিশুদের কাছে অনুপ্রেরণার কাজ করে। পুরস্কারজয়ী অসামান্য মেধাবী এই শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী হালকা মেজাজে শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন, শিশুরা তাঁর কাছে অটোগ্রাফের অনুরোধ জানায়। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার দুটি বিভাগে দেওয়া হয়ে থাকে। শিশুদের কল্যাণে অসামান্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বালশক্তি পুরস্কারের জন্য ২৬ জনের নাম মনোনীত করে। বাল কল্যাণ পুরস্কার প্রদানের জন্য জাতীয় নির্বাচক কমিটি দু'জন ব্যক্তি ও তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম চূড়ান্ত করে।

ভোটদাতাদের সচেতন করতে কর্মশিবিরের আয়োজন ভারতের নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আকাশবাণী ও প্রথম সারির বিভিন্ন বেসরকারি এফএম চ্যানেলের রেডিও জকিদের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি কর্মশিবিরের আয়োজন করেছে। বিগ এফএম, রেড এফএম, ফিভার ১০৪ এফএম, রেডিও নশা, ইশ্‌ক এফএম ও রেডিও সিটির মতো নামি এফএম চ্যানেলগুলির ১৯ জন রেডিও জকি দু'ঘণ্টার এই কর্মশিবিরে যোগ দেন। ভোটদাতাদের সচেতন করতে তথ্য পরিবেশনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাঁরা অংশ নেন। কমিশন বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তার অঙ্গ হিসেবে রেডিও জকিদের সঙ্গে এই কর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভোটদাতাদের সজাগ ও সচেতন কে তোলার ক্ষেত্রে এফএম রেডিও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। রেডিও জকিদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তুলতে এই কর্মশিবিরের আয়োজন করা হয় যাতে তাঁরা শ্রোতাদের সঠিক তথ্য জানাতে পারেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের সচিব এ কে পাঠক অধিবেশনের সূচনায় এই কর্মশিবির সম্বন্ধে প্রারম্ভিক তথ্য পরিবেশন করেন। এরপর, অংশগ্রহণকারী রেডিও জকিদের ভোটদাতাদের সচেতন করে তুলতে কমিশন গৃহীত একাধিক উদ্যোগ সম্পর্কে জানানো হয়। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র (ইভিএম) ও ভিভিপ্যাট সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানানো হয় এবং ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কমিশন আয়োজিত 'ভোটার তালিকায় নিজের সম্পর্কে তথ্য সঠিক কিনা যাচাই করে নাও' অভিযানের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নবীন গবেষকদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাঠকদেরও উৎসাহিত করার মতো গ্রন্থ

পুস্তক প্রসঙ্গ

অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকার

ইতিহাস কথা বলে। সে কথায় উজ্জীবিত হয় মানুষ। প্রতিটি দেশ ও জাতির একটি ইতিহাস থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক প্রবন্ধে লিখেছেন— 'যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়।' ভারতবর্ষের ছাত্র-যুবরা এক সময় বিদেশিদের লেখা ইতিহাস পড়ে স্বদেশকে জানতো। সেই ইতিহাসে মাটির গন্ধ না থাকায় স্বদেশের প্রতি গৌরববোধ খুব একটা তাদের অনুভব হতো না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বিজাতীয় মনোভাব সম্পন্ন তথাকথিত ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসই পড়তে হতো। সুখের বিষয়, দেরিতে হলেও ইতিহাস লেখার কাজটি দেশের গবেষক, লেখকরা শুরু করেছেন, যাঁদের মাটির সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক রয়েছে।

কুমারেশ বিশ্বাস মহাশয়ের নদীয়ার ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতি বইটি এই সময়ের একটি প্রাসঙ্গিক পুস্তক বলে মনে হয়েছে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান ও দীর্ঘদিনের সংগৃহীত তথ্য নিয়ে এই পুস্তক রচনা করেছেন। লেখকের জন্ম নদীয়া জেলায় হওয়ার ফলে নদীয়ার ইতিহাস লেখার আগ্রহ বহুদিনের। কিন্তু কর্মসূত্রে জেলার বাইরে থাকায় তা সম্ভব হয়নি। তাই অবসরের পর তিনি সমগ্র জেলা পরিভ্রমণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নদীয়া জেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশেষে নদীয়া জেলাবাসীর সঙ্গে পুরো রাজ্যের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-গবেষকদের জন্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন।

আধুনিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এছাড়া ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নদীয়া জেলা সম্পর্কে অনেকেই পুস্তক লিখেছেন, সেই দিক দিয়ে এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য হলো নদীয়ার অবহেলিত বা উপেক্ষিত স্থান আলোচ্য

পুস্তকের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই পুস্তকের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো নদীয়া জেলার ইতিহাস যাঁদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের কথাও লেখক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেছেন। লেখক পুস্তকের শুরুতে 'ভবানন্দ মজুমদার ও বংশধর' অধ্যায় দিয়ে শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন নদীয়ার জনজাতিদের কথা অধ্যায় দিয়ে। এছাড়া তাঁর পুস্তকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও দেওয়ান রঘুনন্দন, সেন যুগ, তুর্কী আক্রমণ, নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব, কৃষ্ণনগর শহরের প্রতিষ্ঠা, নীলচাষ ও কুঠি, নদীয়ার বিভিন্ন মেলা, নদীয়ার বিশিষ্ট গ্রাম, বহির্ভারতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব, ইসকন ও স্বামী প্রভুপাদ, প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট ব্যক্তি, নদীয়ার বৈষ্ণব সম্প্রদায়, নদীয়ার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অবিভক্ত নদীয়া জেলার কয়েকটি মহকুমা, বর্তমান প্রশাসনিক বিভাজন, পৌরসভা ও পঞ্চায়েত সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় এই পুস্তকে।

লেখক খুব সুন্দর ভাবে নদীয়া জেলার বর্ণনা করেছেন যা পাঠকদের পক্ষে নদীয়া জেলা সম্পর্কে জানতে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। এই পুস্তক অনেক দিক দিয়ে মৌলিকতার দাবি রাখে যা লেখকের কঠোর পরিশ্রমেরই ফসল বলে মনে হয়। যদিও এই পুস্তকে কয়েকটা বিষয়ের উপর নজর দেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে, যেমন কালানুক্রমিক, লেখার মধ্যে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন ছিল। কেননা আধুনিক গবেষণাধর্মী লেখার ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে কালানুক্রম অনুসারে রচনা করলে ভালো হতো। এছাড়া যদি পুস্তকে দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতির উপর কী প্রভাব পড়েছিল তা আলোচনা করা হতো তাহলে বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে খুব ভালো হতো। এসব সত্ত্বেও এই সময়ে এই ধরনের পুস্তক লেখার জন্য লেখকের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। নবীন গবেষকদের এই পুস্তক খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হিসেবে কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয়। এক কথায় পুস্তকটি সাধারণ পাঠকদেরকেও উৎসাহিত করবে নদীয়া জেলা সম্পর্কে জানতে।

নদীয়ার ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতি।
লেখক : কুমারেশ বিশ্বাস।
প্রকাশক : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।
মূল্য : তিনশত টাকা।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

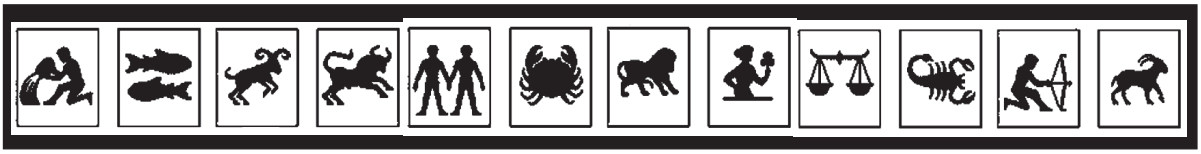

৪ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শুক্র-শনি, মকরে রবি-বুধ-কেতু, মীনে মঙ্গল। মঙ্গলবার সকাল ১১-২০ মিনিটে মঙ্গলের মেষে প্রবেশ।

মেষ : কলাবিদ্যায় রুচি, জ্ঞানার্জনে উদ্যোগী। প্রখর স্মরণশক্তি, তার্কিক প্রতিভা, স্বতন্ত্র বিচারধারায় পরিজন প্রতিবেশীর সঙ্গে সু-সম্পর্ক ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে সাফল্য। মাতার শরীরের যত্নের প্রয়োজন। পেশাগত কর্মকুশলতা ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। বেকারত্বের কর্মলাভ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও দুর্বল শ্রেণী প্রতি মমত্ব।

বৃষ : প্রতিভার ব্যাপ্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। স্বজন সম্পর্কে স্বাচ্ছন্দ্য, পুলিশ মিলিটারির যোগ্যতার পূর্ণ মূল্যায়ন, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব। দালালি, প্রমোটারি, রিপ্রেজেন্টেটিভদের ব্যবসায় অগ্রগতি। সন্তানের নতুন যোগাযোগে উৎসাহ, তবে দুর্জন প্রতিবেশী থেকে সতর্ক।

মিথুন : বিচারশীল, শিল্প ও সৌন্দর্য সুধায় ভরপুর মন। শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণায় অগ্রণী ও মানসিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধি। কঠিন সমস্যা সমাধানে স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয়। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার, গৃহ ও বাহন যোগ। বহুজনের সঙ্গসুখ। জনকল্যাণমূলক কর্মে প্রবণতা বৃদ্ধি।

কর্কট : বিদ্বান, সুবক্তা, সম্পদ ও মিত্রলাভ। কর্মে উদ্যমী, মন-মানসিকতা, ঐশ্বর্য ও দরদি শিল্প-সাহিত্য ও ভাস্কর্যের পূজারি। প্রভাবী ব্যক্তিত্ব ও গুণীজন সান্নিধ্য। সুখকর বদলি-পদোন্নতি ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। নবনির্মাণের প্রস্তুতি। বৈদেশিক ক্ষেত্রেও রমণীর সূত্রে লাভবান। টাইফয়েড, কফ ও বদহজম জনিত সমস্যা।

সিংহ : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও বাক্‌চাতুর্যে দীপ্তিমান। প্রযুক্তিবিদ ব্যবহারজীবী, অনুবাদক, সাংবাদিক শিল্পী, সাহিত্যিকের সৃজনশীলতায় দেবী কৃপালাভ। ভ্রাতা-ভগ্নীর সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তি বিষয়ক ফলপ্রসু পদক্ষেপ। যুবক মিত্র ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্র শুভ নয়।

কন্যা : অস্থিরচিত্র, অপরিকল্পিত ব্যয়। ত্বক, প্যারালাইসিস বিষয়ে সতর্কতা, বাক্‌সংযমী হওয়া প্রয়োজন। নির্দিষ্ট পেশা ব্যতীত বিকল্প পথের সন্ধান, ভ্রাতৃ বিরোধ ও ব্যয়াধিক্য যোগ। সন্তানের কর্মে মনসংযোগ ও উদ্দীপনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির যোগ।

তুলা : বিদ্যা, ব্যবসা, স্বজনবান্ধব, সুহৃদ সম্পর্ক ও কর্মদক্ষতায় সম্ভ্রম ও সমৃদ্ধি। গবাদি পশু-বাহন ও বাসস্থানের যোগ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে কর্মক্ষেত্রে স্পর্শকাতর সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ স্পষ্ট বাক্যে বিরোধিতার প্রশমন। স্বর্ণ, বস্ত্র, ঔষধ, শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসার সফল উদ্যোগ ও শ্রীবৃদ্ধি।

বৃশ্চিক : জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থতায় প্রবাস। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপের কারণে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা ও উদ্বেগ। সন্তানের বুদ্ধির উন্মেষ ও কর্ম দক্ষতায় পারিবারিক আভিজাত্য ও গৌরব বৃদ্ধি। সপ্তাহের শেষভাগে মূল্যবোধের পরিসর ও দৃষ্টির প্রতিভায় ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার। প্রেমের পূর্ণতায় সহনশীলতা কাম্য।

ধনু : চিন্তা ভাবনায় স্থিরতা অভাব। স্বজন বান্ধব, গৃহের পরিবেশ ও যুবক বন্ধু হিতকর নহে, ড্রপসি, লিভার পীড়া ও যান চালকদের বিশেষ সতর্কতা দরকার। সন্তান-সন্ততির জেদ ও আধুনিক মনস্কতা সুলভ আচরণ। কর্মে অতিরিক্ত দায়িত্ব। বিশিষ্টজনের সহয়তা লাভ, পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্তি। সপ্তাহের প্রান্তভাগে রসনা তৃপ্তি ও ভ্রমণে ব্যয়।

মকর : গৃহশ্রী ও গৃহস্বামী উভয়েরই শরীরের যত্নের প্রয়োজন। ভ্রাতা-ভগ্নীর উন্নতির সংবাদ প্রাপ্তি। ভূসম্পত্তি ক্রয় ও সেবামূলক কর্মে মানসিক প্রশান্তি। ব্যবসায় বিনিয়োগ ও লিখিত চুক্তিতে সাবধানতা অবলম্বন জরুরি। সাহিত্য-পিপাসু ও রমণীর প্রতি দুর্বলতা। কুটুম্বিতা বিস্মিত হতে পারে।

কুম্ভ : দৃঢ় ব্যক্তিত্ব কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। শিল্পরাগী, বাস্তবাদী, সুন্দরে পূজারি। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও প্রগতিতে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের সাফল্যের বারিধারা বর্ষণ। ওষুধ ব্যবসা, টেকনিকাল ও ফরেস্ট ইঞ্জিনিয়ারের বহুমুখী কর্ম প্রয়াস। গোপন শত্রুতা, নিম্নাঙ্গের চোট, আঘাত ও সরীসৃপ থেকে সতর্ক থাকবেন।

মীন : দয়ার্দ্র হৃদয় ও মানসিক উদ্দীপনায় ভরপুর মন। অপ্রত্যাশিত কর্ম পরিবর্তন অসম্ভব নহে, গণিতজ্ঞ, সর্ভেয়ার প্রযুক্তিবিদ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, চাটার্ড অ্যাকউন্টেন্টদের প্রতিভার ব্যাপ্তি ও স্বীকৃতি। সন্তানের চাল-চলনে নেতিবাচক পরিবর্তন। দেব-দ্বিজে ও গুরুজনে ভক্তি, সমাজ প্রগতিমূলক কর্মে সামাজিক স্বীকৃতি।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য